সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

ইসলামের হাকীকত

সূচীপত্র

মুসলমান কাকে বলে	৫
ঈমানের পরীক্ষা	১৬
ইসলামের নির্ভুল মানদণ্ড	২৪
আল্লাহর হুকুম পালন করা দরকার কেন ?	৩২
দ্বীন ও শরীয়াত	৪০

ইসলামের হাকীকত

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

আল্লাহর হেদায়াত মেনে চলে আর কতকগুলো নিজের নফসের হুকুম মতো কিংবা বাপ-দাদার প্রথা মতো অথবা মানুষের রচিত আইন অনুযায়ী করে তবে যতখানি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে ঠিক ততখানি কুফরির মধ্যে লিপ্ত হবে। এ হিসেবে কেউ অর্ধেক কাফের, কেউ চার ভাগের এক ভাগ কাফের। কারো মধ্যে আছে দশ ভাগের এক ভাগ কুফরী আবার কারো মধ্যে আছে কুড়ি ভাগের এক ভাগ। মোটকথা, আল্লাহর আইনের যতখানি বিরোধিতা করা হবে ততখানি কুফরি করা হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বস্তুত কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার বান্দাহ হয়ে থাকা এবং নফস, বাপ-দাদা, বংশ-গোত্র, মৌলভী সাহেব, পীর সাহেব, জমিদার, তহশীলদার, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কারো আনুগত্য না করারই নাম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাস হবে না। আর কারো দাসত্ব কবুল করবে না—এটাই হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির কাজ। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ○- ال عمران : ٦٤

"(হে নবী !) আহলে কিতাবদের বল ঃ আস, আমরা ও তোমরা এমন একটা কথায় একত্রিত হই, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য (অর্থাৎ তোমাদের নবীরা যা বলেছে, আমিও আল্লাহর নবী হওয়ার কারণে তাই বলছি।) তা এই যে, (১) আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোও বান্দাহ হবো না, (২) আল্লাহর উলূহিয়াতের সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবো না এবং (৩) আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকেও নিজের অভিভাবক ও মালিক বলে মান্য করবো না। এ তিনটি কথা যদি তারা স্বীকার না করে তবে তোমরা তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান—অর্থাৎ আমরা এ তিনটি কথাই পুরোপুরি কবুল করে নিচ্ছি।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ○ - ال عمران : ٨٣

"তোমরা কি আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করতে চাও ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে। আর সকলেই তাঁর কাছে ফিরে যাবে।"

এ দু'টি আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে। তা এই যে, আসল দীন হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ পালন করা। আল্লাহর ইবাদাতের অর্থ কেবল এটাই নয় যে, দিন-রাত পাঁচবার তাঁর সামনে সিজদা করলেই ইবাদাতের যাবতীয় দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়ে যাবে। বরং দিন-রাত সর্বক্ষণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করে চলাকেই প্রকৃতপক্ষে ইবাদাত বলে। যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা হতে ফিরে থাকা এবং তিনি যা করতে আদেশ করেছেন তা পূর্ণরূপে পালন করাই হচ্ছে ইবাদাত। এজন্য প্রত্যেকটি কাজে এবং প্রত্যেকটি হুকুমের ব্যাপারেই কেবলমাত্র আল্লাহর খোঁজ নিতে হবে। নিজের মন ও বিবেক-বুদ্ধি কি বলে, বাপ-দাদারা কি বলে বা করে গেছেন, পরিবার, বংশ ও আত্মীয়গণের মত কি, জনাব মৌলভী সাহেব আর জনাব পীর সাহেব কেবলা কি বলছেন, অমুক সাহেবের হুকুম কি, কিংবা অমুক সাহেবের মত কি—এসব মাত্রই দেখবে না এবং সেই দিকে মাত্রই ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। আল্লাহর হুকুম ত্যাগ করে এদের কারোও হুকুম পালন করলে আল্লাহর সাথে শিরক করা হবে এবং যার হুকুম মান্য করা হবে তাকে আল্লাহর মতো সম্মান দান করা হবে। কারণ হুকুম দেয়ার ক্ষমতা তো কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার ঃ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ। "আল্লাহর হুকুম ছাড়া মানুষ অন্য কারো হুকুম মানতে পারে না।" মানুষের ইবাদাত-বন্দেগী তো কেবল তিনিই পেতে পারেন, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার অনুগ্রহে মানুষ বেঁচে আছে। আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই তাঁর হুকুম পালন করে চলছে। একটি পাথর অন্য পাথরের হুকুম মতো কাজ করে না, একটি গাছ আর একটি গাছের আনুগত্য করে না, কোনো পশু অন্য পশুর হুকুমবরদারী করে চলে না। কিন্তু মানুষ কি পশু. গাছ ও পাথর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা তো শুধু আল্লাহর আনুগত্য করবে, আর মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে অন্য মানুষের নির্দেশ মতো চলতে শুরু করবে ? একথাই কুরআনের উল্লেখিত তিনটি আয়াতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

এ কুফর ও গোমরাহী কোথা হতে আসে এবং মানুষের মধ্যে এটা কিরূপে প্রবেশ করে, অতপর এ সম্পর্কেই আলোচনা করবো। কুরআন শরীফ এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করার ভাব তিনটি পথে প্রবেশ করে।

প্রথম পথ হচ্ছে মানুষের নিজের নফসের খাহেশ ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ - القصص : ٥٠

"আল্লাহর দেয়া বিধান পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি নিজের নফসের ইচ্ছামত চলে তার অপেক্ষা অধিক গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে ? এ ধরনের যালেম লোকদেরকে আল্লাহ কখনই সৎপথের সন্ধান দেন না।"

এর অর্থ এই যে, মানুষকে গোমরাহ করার মতো যত জিনিস আছে তার মধ্যে মানুষের নফসই হচ্ছে তার সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি। যে ব্যক্তি নিজের খাহেশাতের দাসত্ব করবে, আল্লাহর বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান হবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, আরাম ও সুখ যে কাজে অধিক মিলবে সে কেবল সেসব কাজেরই সন্ধান করবে এবং যেসব কাজে তা দেখতে পাবে, কেবল সে কাজই করতে সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ নিষেধও করে থাকেন, তবুও সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। আর এসব জিনিস যেসব কাজে পাওয়া যাবে না সেসব কাজ করতে সে কখনও প্রস্তুত হবে না। আল্লাহ তাআলা যদি সেই কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবুও সে তার কিছুমাত্র পরোয়া করবে না। এমতাবস্থায় একথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ তাআলাকে তার খোদা রূপে স্বীকার করেনি বরং তার নফসকেই সে তার একমাত্র খোদার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এমন ব্যক্তি কোনো প্রকারে আল্লাহর হেদায়াত লাভ করতে পারে না। কুরআন শরীফে একথা অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে ঃ

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰهُ ط اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً ○ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ط اِنْ هُمْ اِلاَّ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلاً ○ - الفرقان : ٤٣-٤٤

"(হে নবী !) যে ব্যক্তি নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ ? তুমি কি এ ধরনের মানুষের পাহারাদারী করতে পার ? তুমি কি মনে কর যে, এদের মধ্যে অনেক লোকই (তোমার দাওয়াত) শোনে এবং বুঝে ? কখনও নয়। এরা তো একেবারে জন্তু-জানোয়ারের মত বরং তা অপেক্ষাও এরা নিকৃষ্ট।"

যে ব্যক্তি নফসের দাস, সে যে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। কোনো পশুকে আপনারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করতে দেখবেন না। প্রত্যেক পশু সেই জিনিসই আহার করে যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য খায় যে পরিমাণ তার জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। আর যে জানোয়ারের জন্য যত কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে প্রত্যেক জানোয়ার সে কাজই করে যায়। কিন্তু এ মানুষ এমনই এক শ্রেণীর পশু যে, সে যখন নফসের দাস হয়ে যায়, তখন সে এমন সব কাজ করে যা দেখে শয়তানও ভয় পেয়ে যায়।

মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার এটাই প্রথম কারণ। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে এই যে, বাপ-দাদা হতে যেসব রসম-রেওয়াজ, যে আকীদা-বিশ্বাস ও মত এবং যে চাল-চলন ও রীতিনীতি চলে এসেছে তার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকার দরুন মানুষ তার গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষাও তাকে বেশী সম্মানের যোগ্য বলে মনে করে। সেই রসম-রেওয়াজের বিপরীত আল্লাহর কোনো কোনো হুকুম যদি তার সামনে পেশ করা হয়, তবে সে অমনি বলে ওঠে বাপ-দাদারা যা করে গেছে; আমার বংশের যে নিয়ম বহুদিন হতে চলে এসেছে, আমি কি তার বিপরীত কাজ করতে পারি ? পূর্ব-পুরুষের নিয়মের পূজা করার রোগ যার মধ্যে এতখানি, আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়া তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে তার বাপ-দাদা এবং তার বংশের লোকেরাই তার খোদা হয়ে বসে। সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করলে তা যে মিথ্যা দাবী হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বড় কড়াকড়িভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
آبَآءَنَا ؕ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○ - البقرة : ١٧٠

"যখনই তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করে চল, তখন তারা শুধু একথাই বলে উঠেছে যে, আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে, আমরা কেবল সে পথেই চলবো। কিন্তু তাদের বাপ-দাদারা যদি কোনো কথা বুঝতে না পেরে থাকে এবং তারা যদি সৎপথে না চলে থাকে, তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে ?"

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا ؕ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○ يٰٓأَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَايَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ - المائدة : ١٠٤-١٠٥

"যখনই তাদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যে বিধান পাঠিয়েছেন তার দিকে আস এবং রাসূলের দিকে আস, তখনই তারা বলেছে যে, আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলে গেছে, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। কিন্তু তাদের বাপ-দাদারা যদি আসল কথা জানতে না পেরে থাকে এবং তারা যদি সৎপথে না চলে থাকে তবুও কি তারা (অন্ধভাবে) তাদেরই অনুসরণ করে চলবে ? হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের চিন্তা করা উচিত। তোমরা যদি সৎপথে চলতে পার, অন্য লোকের গোমরাহীতে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তোমাদের সকলকেই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাজের ভাল-মন্দ তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবেন।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৪-১০৫

সাধারণভাবে প্রত্যেক যুগের জাহেল লোকেরা এ ধরনের গোমরাহীতে ডুবে থাকে এবং আল্লাহর নবীর দাওয়াত কবুল করতে এ জিনিস তাদেরকে বাধা দেয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন সেই যুগের লোকদেরকে আল্লাহর শরীয়াতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন তখনও তারা একথাই বলেছেনঃ

اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۤءَنَا ۝ - يونس : ٧٨

"আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে তুমি কি সেই পথ হতে আমাদেরকে ভুলিয়ে নিতে এসেছো ?"–সূরা ইউনুস ঃ ৭৮

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন তাঁর গোত্রের লোকদেরকে শির্ক হতে ফিরে থাকতে বললেন, তখন তারাও একথাটি বলেছিল ঃ

وَجَدْنَا اٰبَاۤءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ۝ - الانبياء : ٥٣

"আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এই দেবতারই পূজা করতে দেখেছি।"

মোটকথা প্রত্যেক নবীরই দাওয়াত শুনে সেই যুগের লোকেরা শুধু একথাই বলেছে, "তোমরা যা বলছো তা আমাদের বাপ-দাদার নিয়মের বিপরীত। কাজেই আমরা তা মানতে পারি না।"

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَاۤ ۙ اِنَّا

وَجَدْنَا اٰبَاۤءَنَا عَلٰۤى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰۤى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ۞ قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَاۤءَكُمْ ؕ قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۞ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۞ - الزخرف : ٢٣-٢٥

"এ রকম ঘটনা সবসময়ই ঘটে থাকে যে, যখনই কোনো দেশে আমি নবী পাঠিয়েছি, সেই দেশের অর্থশালী ও সচ্ছল অবস্থার লোকেরা তখনই একথা বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এক নিয়মে চলতে দেখেছি এবং আমরা ঠিক সেই নিয়মে চলছি। নবী তাদেরকে বললেন, তোমাদের বাপ-দাদার নিয়ম-প্রথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা যদি আমি তোমাদেরকে বলি, তবুও কি তোমরা তাদের নিয়ম অনুসারে চলতে থাকবে ? তারা উত্তরে বললো, আমরা তোমার কথা একেবারেই মানি না। তারা যখন এ জবাব দিল তখন আমিও তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করলাম। আর এখন তোমরা দেখে নাও যে, আমার বিধান অমান্যকারীদের পরিণাম কতখানি মারাত্মক হয়েছে।"–সূরা যুখরুফ ঃ ২৩-২৫

এসব কথা প্রকাশ করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা হয় বাপ-দাদারই নিয়ম-প্রথার অনুসরণ কর, না হয় খাঁটিভাবে কেবল আমারই হুকুম মেনে চল ; কিন্তু এ দু'টি জিনিস একত্রে ও এক সাথে কখনও পালন করতে পারবে না। দু'টি পথের মধ্যে মাত্র একটি পথ ধরতে পারবে। মুসলমান হতে চাইলে সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবল আমার হুকুম পালন করে চলতে থাক ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۤءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۞ وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۞ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ - لقمن : ٢١-٢٣

"তাদেরকে যখন বলা হলো যে, তোমরা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণ কর ; তখন তারা বলল যে, আমরা তো শুধু সেই পথই অনুসরণ করে চলবো, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাকে চলতে দেখেছি। কিন্তু শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকে, তবুও কি ? যে ব্যক্তি নিজেকে

পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিয়েছে এবং নেককার হয়েছে সে তো মযবুত রশি ধারণ করেছে। কারণ সকল কাজের শেষ আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করবে—হে নবী, তার অস্বীকারের জন্য তোমার দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই। তারা সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে। তখন আমি তাদের সকল কাজের পরিণাম ফল দেখিয়ে দেব।"–(সূরা লোকমান ঃ ২১-২৩)

মানুষকে গোমরাহ করার এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ। এরপর তৃতীয় পথ সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দিয়ে মানুষের হুকুম পালন করতে শুরু করে এবং ধারণা করে যে, অমুক ব্যক্তি খুব বড়লোক তার কথা নিশ্চয়ই সত্য হবে, কিংবা অমুক ব্যক্তির হাতে আমার রিযক, কাজেই তার হুকুম অবশ্যই পালন করা উচিত অথবা অমুক ব্যক্তির শক্তি ও ক্ষমতা অনেক বেশী, এজন্য তার কথা অনুসরণ করা আবশ্যক ; কিংবা অমুক ব্যক্তি বদ দোয়া করে আমাকে ধ্বংস করে দিবে অথবা অমুক ব্যক্তি আমাকে সাথে নিয়ে বেহেশতে যাবে, কাজেই সে যা বলে তা নির্ভুল মনে করা কর্তব্য অথবা অমুক জাতি আজকাল খুব উন্নতি করছে, কাজেই তাদের নিয়ম অনুসরণ করা উচিত, তখন সে কিছুতেই আল্লাহর হেদায়াত অনুযায়ী কাজ করতে পারে না।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط-الانعام ١١٦

"তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করে চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে ভুলিয়ে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে।"

অর্থাৎ মানুষ সোজা পথে ঠিক তখনই থাকতে পারে যখন তার আল্লাহ কেবলমাত্র একজনই হবে। যে ব্যক্তি শত শত এবং হাজার হাজার লোককে 'খোদা' বলে স্বীকার করবে এবং যে ব্যক্তি কখনও এক খোদার কথা মতো আবার কখনও অন্য আর এক খোদার কথা মতো চলবে সে সোজা পথ কখনই পেতে পারে না।

ওপরের আলোচনায় একথা আপনারা ভাল করেই জানতে পেরেছেন যে, মানুষের গোমরাহ হবার তিনটি বড় বড় কারণ বর্তমান ঃ

প্রথম—নফসের দাসত্ব।

দ্বিতীয়—বাপ-দাদা, পরিবার ও বংশের রসম-রেওয়াজের দাসত্ব।

তৃতীয়—সাধারণভাবে দুনিয়ার মানুষের দাসত্ব, ধনী, রাজা, শাসনকর্তা, ভণ্ড নেতা এবং দুনিয়ার পথভ্রষ্ট জাতিগুলোর দাসত্ব এর মধ্যে গণ্য।

এ তিনটি বড় বড় 'দেবতা' মানুষের খোদা হবার দাবী করে বসে আছে। যে ব্যক্তি মুসলমান হতে চায় তাকে সর্বপ্রথম এ তিনটি 'দেবতাকেই' অস্বীকার করতে হবে এবং যখনই সে তা করবে তখনই সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ তিন প্রকারের দেবতাকে, নিজের মনের মধ্যে বসিয়ে রাখবে এবং এদের হুকুম মতো কাজ করবে, আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে বড়ই কঠিন। সে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়ে, সারাদিন লোক দেখানো রোযা রেখে এবং মুসলমানের মতো বেশ ধারণ করে লোককে শুধু ধোঁকাই দিতে পারবে। সে নিজেকেও ধোঁকা দিতে পারবে যে, সে খাঁটি মুসলমান হয়েছে। কিন্তু এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, এরূপ কৌশল করে আল্লাহকে কখনও ধোঁকা দিতে পারবে না।

ওপরে আমি যে তিনটি 'দেবতার' উল্লেখ করেছি, এদের দাসত্ব করাই হচ্ছে আসল শিরক। আপনারা পাথরের দেবতা ভাংগিয়েছেন, ইট ও চুনের সমন্বয়ে গড়া মূর্তি ও মূর্তিঘর আপনারা ধ্বংস করেছেন ; কিন্তু আপনাদের বুকের মধ্যে যে মূর্তিঘর বর্তমান রয়েছে, সেই দিকে আপনারা মোটেই খেয়াল করেননি। অথচ মুসলমান হওয়ার জন্য এ মূর্তিগুলোকে একেবারে চূর্ণ করে দেয়াই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দরকারী কাজ ও সর্বপ্রথম শর্ত। যদিও আমি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে লক্ষ্য করেই একথা বলছি এবং আমি জানি যে, দুনিয়ার মুসলমান যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে, এ তিন প্রকারের দেবতার পূজা করাই হচ্ছে তার একমাত্র কারণ। কিন্তু এখানে আমি কেবল এ দেশীয় মুসলমান ভাইগণকে বলছি যে, আপনাদের অধপতন আপনাদের নানা প্রকারের অভাব-অভিযোগ ও বিপদের মূল হচ্ছে উপরোক্ত তিনটি জিনিস। নফসের দাসত্ব, বংশগত প্রথার দাসত্ব এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য মানুষের দাসত্ব আপনাদের মধ্যে এখনও খুব বেশী পরিমাণেই আছে। আর এটাই ভিতর থেকে আপনাদের শক্তি এবং দ্বীন ও ঈমানকে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে। আপনাদের মধ্যে আশরাফ-আতরাফ, কুলীন-গৃহস্ত এবং ছোট লোক বড় লোকের পার্থক্য আছে। আর এরূপে আপনাদের সমাজের লোকদেরকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এ সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে এক জাতি ও পরস্পরের ভাই করে একটি মযবুত দেয়ালের মত করতে চেয়েছিল। সেই দেয়ালের প্রত্যেকখানা ইট অন্য ইটের সাথে মযবুত হয়ে গেঁথে থাকবে, এটাই ছিল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। অথচ আপনারা এখনও সেই পুরাতন হিন্দুয়ানী জাতিভেদের ধারণা নিয়ে রয়েছেন। হিন্দুদের এক গোত্র যেমন অন্য গোত্র হতে পৃথক থাকে আর এক জাতি অন্য জাতিকে ঘৃণা করে আপনারাও ঠিক তাই করছেন। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আপনারা

পরস্পর কোনো কাজ করতে পারেন না। সকল মুসলমানকে আপনারা সমানভাবে ভাই বলে গ্রহণ করতে পারেন না। মুখে মুখে ভাই বলে থাকেন, কিন্তু কাজের বেলায় আপনাদের মধ্যে ঠিক সেরূপ পার্থক্য থেকে যায় যেমন ছিল আরব দেশে ইসলামের পূর্বে। এসব কারণে আপনারা পরস্পর মিলে একটা মযবুত দেয়াল হতে পারেন না। ভাংগা দেয়ালের নানা দিকে ছড়ানো ইটের মতো আপনারা এক একজন মানুষ পৃথক হয়ে পড়ে রয়েছেন। এ জন্যই না আপনারা এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে পারছেন, না কোনো বিপদ-আপদের মুকাবিলা করতে পারছেন। ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা অনুযায়ী আপনাদেরকে যদি বলা যায় যে, এ সমস্ত ভেদাভেদ ও পার্থক্য চূর্ণ করে দিয়ে ও পরস্পর মিলে-মিশে এক হয়ে যান তাহলে আপনারা তখন ঐ এক কথাই বলবেন যে, আমাদের বাপ-দাদার কাল হতে যে প্রথা চলে এসেছে তা আমরা ভেংগে দিতে পারি না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এর উত্তরে কি বলবেন তা কি আপনারা জানেন ? তিনি বলবেন, বেশ তোমরা এ সমস্ত ভেংগ না, আর এ সমস্ত অমুসলমানী আচার ছেড়ো না, ফলে আমিও তোমাদের একেবারে টুকরো টুকরো করে দেব এবং তোমরা দুনিয়ায় বহু লোক হওয়া সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অধপতিত করে রাখবো।

আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে আদেশ করেছেন, তোমাদের ছেলে-মেয়েরা সকলেই তোমাদের সম্পত্তির অংশ পাবে। কিন্তু আপনারা এর কি উত্তর দিয়েছেন ? আপনারা বলেছেন, আমাদের বাপ-দাদার আইনে মেয়েরা সম্পত্তির অংশ পেতে পারে না—পেতে পারে একমাত্র ছেলেরাই। কাজেই আমরা বাপ-দাদার আইন মানি আল্লাহর আইন মানতে পারি না। একটু চিন্তা করে দেখুন, এর নাম কি ইসলাম ? আপনাদেরকে বলা হয়েছে যে, বংশগত ও দেশ প্রচলিত আইন পরিত্যাগ কর, উত্তরে আপনাদের প্রত্যেকেই বলে ওঠবেন—সকলে যখন ত্যাগ করবে তখন আমিও করবো। কেননা অন্য লোক যদি তাদের মেয়েকে সম্পত্তির অংশ না দেয়, তাহলে আমার সম্পত্তি তো অন্যের ঘরে চলে যাবে, কিন্তু অন্যের ঘর হতে আমার ঘরে কিছুই আসবে না। ... ভেবে দেখুন, এ উত্তরের অর্থ কি ? অপরে যদি আল্লাহর আইন মানে তবে আপনি মানবেন, এরূপ শর্ত করে কি আপনি আল্লাহর আইনের প্রতি ঈমান এনেছেন ? তাহলে কাল আপনি এটাও বলতে পারেন যে, অপরে ব্যভিচার করলে আমিও ব্যভিচার করবো, অপরে চুরি করলে আমিও চুরি করবো। মোটকথা অপরে যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত গোনাহ না ছাড়বে আমিও ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত গোনাহ করতে থাকবো। আসল কথা এই যে, এ ব্যাপারে আমাদের দ্বারা উল্লেখিত তিনটি দেবতারই পূজা করানো হচ্ছে। নফসের বন্দেগী করছেন,

বাপ-দাদার প্রথারও বন্দেগী করছেন, আর দুনিয়ার মুশরিক জাতিগুলোর দাসত্বও আপনারা করছেন। অথচ এ তিনটি দেবতার পূজার সাথে সাথে ইসলামের দাবীও আপনারা করছেন। এখানে মাত্র দু'টি উদাহরণ আমি উল্লেখ করলাম। নতুবা একটু চোখ খুলে তাকালে এত প্রকারের বড় বড় রোগ আপনাদের মধ্যে দেখা যাবে যে, তা গুণেও শেষ করা যাবে না এবং লক্ষ্য করলে আপনি দেখবেন যে, কোথাও একটি দেবতার পূজা চলছে, কোথাও দু'টি দেবতার পূজা চলছে। অপর কোথাও তিনটি দেবতারই পূজা চলছে। তিনটি দেবতার পূজা করার সাথে সাথে ইসলামেরও দাবী করা একটা হাস্যকর ব্যাপার এবং এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা খাঁটি মুসলমানদের ওপর যে অফুরন্ত রহমত নাযিল করার ওয়াদা করেছেন, ঠিক তাই আমাদের ওপর নাযিল হবে—এরূপ আশা করাও কম হাস্যকর ব্যাপার নয়।

ঈমানের পরীক্ষা

পূর্বের প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, কুরআনের মতে মানুষের গুমরাহ হবার আসল কারণ হচ্ছে তিনটি। প্রথম, আল্লাহর আইন ত্যাগ করে নিজের নফসের খাহেশাতের গোলাম হওয়া ; দ্বিতীয়, আল্লাহর আইনের মোকাবিলায় নিজের বংশের রসম-রেওয়াজ ও বাপ-দাদার পথ অনুসরণ করা এবং তৃতীয়, আল্লাহ ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথনির্দেশ করেছেন, তাকে দূরে নিক্ষেপ করে দুনিয়ার মানুষের আনুগত্য করা—সেই মানুষ তার নিজের জাতির প্রতিপত্তিশালী লোক হোক, কিংবা ভিন্ন জাতিরই হোক।

মুসলমানের খাঁটি পরিচয় এই যে, সে এ তিন প্রকারের রোগ ও গোমরাহী হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। মুসলমান শুধু তাকেই বলে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস নয় এবং রাসূল ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করে না। সেই ব্যক্তি মুসলমান, যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর নবীর শিক্ষাই সম্পূর্ণ সত্য, এর বিপরীত যা, তা সবই মিথ্যা। মানুষের দীন-দুনিয়ার মংগল ও উন্নতি কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের মহান শিক্ষার ভেতরেই নিহিত আছে। একথা যে ব্যক্তি নিসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারবে, সে তার জীবনের প্রত্যেক কাজেই কেবল অনুসন্ধান করবে আল্লাহর হুকুম কি, রাসূলের বিধান কি ? আর যখনই তা সে জানতে পারবে তখনই সে সোজাসুজি এর সামনে তার মাথা নত করে দেবে। অতপর তার মন যতই অস্থির হোক না কেন, তার বংশের লোক তাকে ফিরাতে যতই চেষ্টা করুক না কেন এবং দুনিয়ার লোক তার যতই বিরোধিতা করুক না কেন, সে তাদের কারো পরোয়া করবে না। কারণ সে প্রত্যেককেই এই একমাত্র জবাব দিবে, 'বাঃ আমি তো একমাত্র আল্লাহ তাআলারই বান্দাহ—তোমাদের কারো বান্দাহ নই আর আমি রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি—তোমার ওপর ঈমান আনিনি।" কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ও রাসূলের যদি এটা হুকুম হয়ে থাকে তবেই হোক না, আমার অন্তর তা মানে না ; অথবা তাতে আমার ক্ষতি হবার আশংকা আছে ; কাজেই আমি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম ছেড়ে আমার নিজের মতে চলবো —তাহলে এমন ব্যক্তির মনে ঈমানের নাম গন্ধও অবশিষ্ট থাকবে না। সে মু'মিন নয়—বরং মুনাফিক ; মুখে মুখে যদিও সে কেবল আল্লাহর বান্দাহ ও নবীর অনুসরণকারী হবার দাবী করে ; কিন্তু আসলে সে নিজের নফসের বান্দাহ আর তার নিজের মতেরই অনুসরণকারী।

অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম যাই হোক না কেন ; কিন্তু অমুক নিয়ম যেহেতু বাপ-দাদার কাল হতে চলে এসেছে,

সুতরাং তাকে কেমন করে ছাড়া যায় ? অথবা অমুক নিয়ম তো আমার বংশ বা গোত্রে আবহমানকাল হতে চলে এসেছে, আজ আমি এর বিপরীত কেমন করে করবো ? তাহলে এমন ব্যক্তিকেও ঐ মুনাফিকের দলে গণ্য করতে হবে। নামায পড়তে পড়তে তার কপালে যতই দাগ পড়ুক না কেন, আর প্রকাশ্যে সে যতই ধার্মিকের বেশ ধারণ করে থাকুক না কেন ; কিন্তু আসলে সে একজন মুনাফিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ এই যে, ধর্মের মূল তত্ত্ব তার মনে মোটেই স্থান পায়নি—তার মন খাঁটিভাবে ইসলামকে কবুল করে না। শুধু রুকূ'-সিজদাহ বা রোযা ও হজ্জকে 'দ্বীন ইসলাম' বলা হয় না। আর মানুষের বাহ্যিক বেশকে মুসলমানের মত করে নিলে 'দীন' পালন করা হয় না। বরং আসলে 'দীন' বা ধর্ম বলা হয় আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করাকে। যে ব্যক্তি নিজের জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে তার মনে প্রকৃতপক্ষে 'দীন'-এর নাম গন্ধও বর্তমান নেই। তার নামায, রোযা এবং তার পরহেযগারী ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনুরূপভাবে কোনো মানুষ যদি আল্লাহ এবং তাঁর নবীর হেদায়াতের প্রতি বেপরোয়া হয়ে বলে যে, যেহেতু ইউরোপীয় বা আমেরিকান জাতির মধ্যে অমুক জিনিসের খুব প্রচলন আছে এবং তারা উন্নতি লাভ করেছে, অতএব তা আমাদেরও গ্রহণ করা উচিত ; কিংবা অমুক জাতি অমুক কাজ করেছে, অমুক বড় লোক একথা বলেছেন, কাজেই তা আমাদেরও পালন করা কর্তব্য, তাহলে এমন ব্যক্তির ঈমান আছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। ঈমান থাকলে এসব কথা কেউ বলতে পারে না। বাস্তবিকই যদি মুসলমান হয়ে থাকেন এবং মুসলমানই থাকতে চান, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের বিপরীত যে কথাই হবে তাই দূরে নিক্ষেপ করতে হবে। এরূপ করতে না পারলে ইসলামের দাবী করা কারো পক্ষে শোভা পায় না। 'আল্লাহ ও রাসূলকে স্বীকার করি' বলে মুখে দাবী করা আর জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারে সবসময়ই আল্লাহ ও রাসূলের কথাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার লোকদেরকে অনুসরণ করা—এটা না ঈমান না ইসলাম, এর নাম মুনাফিকী ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

পবিত্র কুরআনের ১৮শ পারায় আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ط وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○
وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
ذٰلِكَ ط وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ

بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْۤا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ○ اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْۤا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○ - النور : ٤٦-٥٢

"আমি হক ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী আয়াতসমূহ নাযিল করে দিয়েছি। আল্লাহ্ যাকে চান এ আয়াতের সাহায্যে তাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন। লোকেরা বলে আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা (তাঁদের) আনুগত্য স্বীকার করছি ; কিন্তু পরে তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক আনুগত্য করা ছেড়ে দেয়। এ শ্রেণীর লোকেরা ঈমানদার নয়। তাদের কাজ-কারবারের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আইন অনুসারে ফায়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে ডাকা হয় তখন কিছু লোক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। কিন্তু আল্লাহর আইনের ফায়সালা যদি তাদের মনের মত হয় তবে অবশ্য তা স্বীকার করে নেয়। তাদের মনের মধ্যে কি রোগ আছে ? না তারা শুধু অকারণ সন্দেহের মধ্যে ডুবে রয়েছে ? অথবা তাদের এ ভয় আছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তাদের 'হক' নষ্ট করবেন ? কারণ যাই হোক, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করছে। প্রত্যেক ঈমানদার লোকের নিয়ম এই যে, আল্লাহর আইন অনুসারে বিচার করার জন্য যখন তাদেরকে ডাকা হয় তখন তারা 'আমরা শুনেছি এবং তা অনুসরণ করি' বলে মাথা নত করে দেয়। বাস্তবিক পক্ষে এ শ্রেণীর লোকেরাই মুক্তি ও উন্নতি লাভ করতে পারে। আর যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম পালন করবে, আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর নাফরমানী হতে ফিরে থাকবে কেবল তারাই সফলকাম হবে এবং মুক্তি পাবে।"–সূরা আন নূর ঃ ৪৬–৫২

এ আয়াতসমূহে ঈমানের যে পরিচয় দেয়া হয়েছে আপনারা তা একটু বিশেষভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন। বস্তুত নিজেকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হেদায়াতের সামনে সোপর্দ করে দেয়ার নামই হচ্ছে ঈমান। সেখান হতে যে হুকুম আসে তার সামনে মাথা নত করে দাও। এর বিরোধী কোনো কথা শুনবে

না—না নিজের মনের কথা, না বংশ ও পরিবারের কথা আর না দুনিয়ার লোকদের কথা। যে ব্যক্তির মনের মধ্যে এ গুণ বর্তমান থাকবে প্রকৃতপক্ষে সেই হবে মু'মিন ও মুসলমান। আর যার মধ্যে এ গুণ থাকবে না তাকে মুনাফিক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

আপনারা হয়তো শুনেছেন যে, আরব দেশে মদ পান করার প্রথা খুব বেশী প্রচলিত ছিল। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই মদের জন্য একেবারে পাগল প্রায় ছিল। আসলে মদের প্রতি তাদের অন্তরে গভীর আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল। এর প্রশংসা করে কত যে গযল-গীত তারা রচনা করেছিল, তার হিসেব নেই। মদের জন্য প্রাণ দিতেও তারা প্রস্তুত হতো। একথাও আপনারা জানেন যে, একবার মদের নেশা লাগলে তা দূর হওয়া বড়ই মুশকিল। মদখোর ব্যক্তিরা মদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু মদ ত্যাগ করতে পারে না। কোনো মদখোর যদি মদ না পায় তবে তার অবস্থা কঠিন রোগীর অপেক্ষাও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু যখন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন কি অবস্থা হয়েছিল তা কি আপনারা কখনও শুনেছেন? মদের জন্য পাগল জান দিতে প্রস্তুত সেই আরবরাই এ হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের হাতেই মদের বড় বড় পাত্র ভেংগে ফেলেছিল। মদীনার অলিতে-গলিতে বৃষ্টির পানির মত মদ বয়ে গিয়েছিল। একটি মজলিসে কয়েকজন লোক একত্রে বসে মদ পান করছিল। হযরতের ঘোষণাকারী যখন তাদের কাছাকাছি গিয়ে বললো যে, মদ নিষিদ্ধ হয়েছে, তখন যার হাত যেখানে ছিল তা সেখানেই থেমে গেল আর একটুও কেউ অগ্রসর হলো না। যার হাতের পেয়ালা মুখের সাথে লেগেছিল, সে তখনই তা সরিয়ে নিলো। তারপর আর এক বিন্দু মদ তার উদরে প্রবেশ করতে পারেনি। এটাই হচ্ছে সত্যিকার ঈমানের পরিচয়। আর এটাকেই বলা হয় আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য।

ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি কত কঠিন তা তো আপনাদের অজানা নয়। তা হচ্ছে পিঠে একশত চাবুক। বস্তুত এর কল্পনা করলেও মানুষের শরীর শিউরে ওঠে। আর ব্যভিচারী বিবাহিত হলে তো তাকে একেবারে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। এ কঠিন শাস্তির নাম শুনলেই মানুষ ভয়ে কেঁপে ওঠে। কিন্তু যেসব লোকের খাঁটি ঈমান ছিল, অথচ ভুলবশত তাদের দ্বারা কোনো ব্যভিচারের কাজ হয়ে গিয়েছিল, তাদের অবস্থা কিরূপ ছিল, তা কি আপনারা জানেন? একজন লোক শয়তানের প্রতারণায় পড়ে ব্যভিচার করে বসলো। তার সাক্ষী কেউ ছিল না, আদালতে ধরে নিয়ে যাবারও কেউ ছিল না, পুলিশকে খবর দেয়ার মতো লোকও কেউ ছিল না। কিন্তু তার মনের মধ্যে ছিল খাঁটি ঈমান। আর সেই ঈমান তাঁকে বললো—আল্লাহর আইনকে ভয় না

করে যখন তুমি নফসের খাহেশ পূর্ণ করেছ তখন তাঁর নির্দিষ্ট আইন মতে শাস্তি নিবার জন্য প্রস্তুত হও। কাজেই সে নিজেই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে হাযির হলো এবং নিবেদন করলো ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল ! আমি ব্যভিচার করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন।' হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেই ব্যক্তি আবার সেই দিকে গিয়ে শাস্তি দেয়ার জন্য অনুরোধ করলো এবং বললো, আমি যে পাপ করেছি আমাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিন। এটাকেই বলে ঈমান। এ ঈমান যার মধ্যে বর্তমান থাকবে, খোলা পিঠে একশত চাবুকের ঘা নেয়া এমন কি পাথরের আঘাত খেয়ে মরে যাওয়াও তার পক্ষে সহজ ; কিন্তু আল্লাহর নাফরমানী করে আল্লাহর সামনে হাযির হওয়া তার পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার।

আপনারা এটাও জানেন যে, দুনিয়ার মানুষের কাছে তার আত্মীয়-স্বজনই অতিশয় প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে। বিশেষ করে পিতা-পুত্র-ভাই মানুষের এত প্রিয় যে, তাদের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতেও মানুষ প্রস্তুত হয়। কিন্তু আপনি একবার বদর ও ওহোদের যুদ্ধের কথা চিন্তা করে দেখুন যে, তাতে কে কার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বাপ মুসলমানদের দলে, ছেলে কাফেরদের দলে, ছেলে একদিকে, পিতা অন্যদিকে, এক ভাই ইসলামের পক্ষে অন্য ভাই দুশমনের পক্ষে। একেবারে নিকটতম আত্মীয়গণ দু' দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর এমনভাবে যুদ্ধ করেছে, যেন তারা কেউ কাউকে চিনেই না। কোনো টাকা পয়সা কিংবা জায়গা জমি অথবা কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য তারা যুদ্ধ করেনি। তারা নিজেদের রক্ত দান করে আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে শুধু আল্লাহ ও রাসূলের খাতিরেই যুদ্ধ করেছে। আর আল্লাহ ও রাসূলের জন্য বাপ-ভাই-ছেলে এবং বংশের সকলকেই অকাতরে কুরবান করার মতো প্রচণ্ড মনোবল তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল।

আপনাদের একথাও জানা আছে যে, ইসলাম আরব দেশের প্রায় প্রাচীন রসম-রেওয়াজকে একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল। তখনকার যুগে সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান ছিল মূর্তি পূজা। এ প্রথা শত শত বছর ধরে চলে আসছিল। কিন্তু ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলো, এ মূর্তিগুলো পরিত্যাগ কর। মদ পান, ব্যভিচার, জুয়া, চুরি, ডাকাতি আরব দেশের নিত্যকার ঘটনা ছিল। ইসলাম বললো, এসব ছাড়তে হবে। আরব দেশের নারীরা একেবারে খোলাখুলিভাবে চলাফিরা করতো। ইসলাম আদেশ করলো, এরূপ চলতে পারবে না পর্দার ব্যবস্থা কর। মেয়েদেরকে সেখানে সম্পত্তির অংশ দেয়া হতো না। ইসলাম

ঘোষণা করলো, পুরুষদের মতো মেয়েরাও সম্পত্তির অংশ পাবে। পালিত পুত্রকে সেখানে ঠিক আপন ঔরষজাত পুত্রের মতো মনে করা হতো। ইসলাম বললো, এটা হতে পারে না। পরের ছেলে পালন করলেই একেবারে নিজের ঔরষজাত সন্তানের মতো হয়ে যায় না। এমনকি পালিত পুত্র তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে বিয়েও করা যেতে পারে। মোটকথা, এ সমস্ত পুরাতন রসমকে সেখানে একটি একটি করে চুরমার করে দেয়া হয়েছিল।

যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছিল, তখন তারা কিভাবে কাজ করেছিল তা কি আপনারা জানেন ? শত শত বছর ধরে যেসব মূর্তিকে তারা এবং তাদের বাপ-দাদারা পূজা করেছে, যেসবের সামনে নানা প্রকারের ভেট ও ভোগ হাযির করেছে এবং যেগুলোর সামনে মাথা ঠেকিয়ে সিজদা করেছে, ঈমানদার ব্যক্তিগণ তা নিজেদেরই হাতে এক একটা করে চূর্ণ করে ফেলেছে। শত শত বছর ধরে যেসব বংশীয় রীতিনীতি ও রসম-রেওয়ায চলে আসছিল তা সবই তারা পরিত্যাগ করেছিল ; যেসব জিনিসকে তারা মহান ও পবিত্র বলে ধারণা করতো, আল্লাহর হুকুম পেয়েই তারা তাকে পায়ের তলে দলিত করলো। যেসব জিনিস তারা ঘৃণা করতো আল্লাহর হুকুম পাওয়া মাত্রই তাকে ভাল মনে করে গ্রহণ করতে লাগলো। চিরকাল যেসব জিনিসকে পাক ও পবিত্র মনে করা হতো, আল্লাহর বিধান মতো সেই সবকে অপবিত্র মনে করতে শুরু করলো। আর যেসব জিনিসকে অপবিত্র মনে করতো, সহসা তা পবিত্র হয়ে গেল। যেসব কাফেরী চালচলনে তারা আরাম ও সুখ মনে করতো, আল্লাহর হুকুম পাওয়া মাত্রই তা সবই ছেড়ে দিয়েছিল এবং ইসলামের যেসব হুকুম পালন করা মানুষের পক্ষে কষ্টকর বলে মনে হতো তারা সেইসবকে সানন্দে কবুল করে নিলো। এরই নাম ঈমান এবং একেই বলা হয় ইসলাম। কিন্তু ভেবে দেখুন, আরব দেশের লোকেরা যদি তখন তাদের বাপ-দাদাদের মতো বলতো, অমুক অমুক কাজ আমরা মানব না, কারণ এতে আমাদের ক্ষতি হবে,—অমুক কাজ আমরা নিশ্চয় করবো কারণ বাপ-দাদার কাল হতেই এটা চলে এসেছে এবং রোম দেশের লোকদের কিংবা ইরান দেশের লোকদের অমুক কাজ আমাদের খুব ভালো লাগে বলে তা আমরা ছাড়তে পারবো না। এরূপে ইসলামের এক একটা হুকুম বাতিল করে দিতো তাহলে দুনিয়ায় এখন একজন মুসলমানও থাকতো কি ?

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ط - ال عمران : ٩٢

"তোমাদের প্রিয় জিনিসগুলোকে যদি তোমরা আল্লাহর জন্য কুরবানী না কর তাহলে তোমরা প্রকৃত কল্যাণ কিছুতেই লাভ করতে পারবে না।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২

এ আয়াতটিই ইসলাম ও ঈমানের মূল কথা। ইসলামের আসল দাবী হচ্ছে, তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দাও। জীবনের সব রকমের কাজ-কারবারেই আপনারা দেখতে পাবেন যে, আল্লাহর হুকুম একদিকে আপনাকে ডাকে, আর আপনাদের নফস ডাকে এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। আল্লাহ্ এক কাজের হুকুম করেন অথচ আপনার নফস সে কাজে আপনার ভয়ানক কষ্ট কিংবা ক্ষতি হবে বলে প্ররোচিত করে। আল্লাহ্ এক কাজ করতে নিষেধ করেন, কিন্তু আপনার নফস তাকে অত্যন্ত মজাদার উপকারী জিনিস মনে করে তা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় না। প্রত্যেক কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে একদিকে আর সারা দুনিয়ার সুখ-সুবিধার আকর্ষণ আপনাকে ডাকতে থাকে সম্পূর্ণ অন্যদিকে। মোটকথা জীবনের প্রত্যেক পদেই মানুষের সামনে দু'টি পথ এসে পড়ে ; একটি ইসলামের পথ, অপরটি কুফর ও মুনাফিকীর পথ। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসকে পদাঘাত করে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেবে, মনে করতে হবে যে, কেবল সেই ব্যক্তিই ইসলামের পথ ধরেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমের ওপর পদাঘাত করে নিজের মনের বা দুনিয়ার খুশী চরিতার্থ করবে, বুঝতে হবে যে, সে কাফেরী এবং মুনাফিকীর পথ গ্রহণ করেছে।

বর্তমান কালের মানুষ সম্পূর্ণ সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করেছে। তারা ইসলামের সরল নিয়মগুলো তো অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বীকার করে, কিন্তু কুফর ও ইসলামের প্রকৃত মোকাবিলার সময় নিজেদের গতি পরিবর্তন করে ফেলে। ইসলামের বড় বড় দাবীদার লোকদের মধ্যেও এ রকম দুর্বলতা রয়েছে। ইসলাম ! ইসলাম ! করে তারা চীৎকার তো খুবই করে, ইসলামের তা'রীফ করতে গিয়েও তাদের মুখে খৈ ফোটে আর সে জন্য লোক দেখানো কাজও তারা যথেষ্ট করে, কিন্তু যে ইসলামের তারা এত তা'রীফ করে থাকে, সকলে মিলিত হয়ে সেই ইসলামের পরিপূর্ণ বিধানকে নিজেদের ওপর জারী করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানালে তারা অমনি বলে উঠে ঃ ঐ কাজ সহজ নয়, এতে নানা প্রকারের কষ্ট আছে কিংবা এখন তা হতে পারে না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলাম একটা সুন্দর খেলনা মাত্র। তাকে তাকের ওপর উঠিয়ে রেখে দিলে এর সৌন্দর্য দেখা যায়। মুখে এর খুবই তা'রীফ করা যেতে পারে, কিন্তু নিজের ও পরিবারের লোকজনের ওপর, আত্মীয়-স্বজনের ওপর,

নিজেদের কাজ-কারবারের ওপর তাকে একটা পরিপূর্ণ আইন হিসেবে জারী করার নাম নেয়া তাদের মতে একটা অপরাধ। আমাদের আজকালকার ধার্মিক বলে পরিচিত ব্যক্তিদের অবস্থা হয়েছে এই—তারপর দুনিয়ার অন্য লোকদের কথা আর কি বলা যায় ? মনে রাখবেন, ঠিক এ কারণেই আজ আমাদের নামায, রোযা, কুরআন তেলাওয়াত ও শরীয়াতের প্রকাশ্য অনুসরণের মধ্যে পূর্বের সেই প্রভাব আর বর্তমান নেই এবং সে জন্যই তাতে আমরা বাস্তব জীবনে কোনো ফলই লাভ করতে পারছি না। কারণ প্রাণটাই যখন না থাকে, তখন প্রাণহীন দেহটা আর কি সুফল দেখাতে পারে ?

ইসলামের নির্ভুল মানদণ্ড

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেছেন ঃ

قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ لاَشَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○ - الانعام : ١٦٣-١٦٤

"(হে মুহাম্মাদ !) বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদাত অনুষ্ঠান এবং আমার জীবন ও মৃত্যু—সবকিছুই আল্লাহর জন্য ; যিনি সারা-জাহানের মালিক ও প্রভু। তাঁর কেউ শরীক নেই। এরূপ বলার জন্যই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর সর্বপ্রথম আমি তাঁরই সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে দিচ্ছি।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৬৩-১৬৪

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ -

"আল্লাহর জন্য যে ভালবাসলো, আল্লাহরই জন্য যে দুশমনী করলো, আল্লাহরই জন্য যে দান করলো এবং আল্লাহরই জন্য দেয়া বন্ধ করলো, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করলো। অর্থাৎ সে কামিল ঈমানদার হলো।"

প্রথমে আমি যে আয়াতের উল্লেখ করেছি তা হতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানুষকে তার সমস্ত দাসত্ব-আনুগত্যের এবং নিজের জীবন ও মৃত্যুকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিষ্ঠা সহকারে উৎসর্গ করার এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিচ্ছে। অন্য কথায় মানুষ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করবে না। তার জীবন-মৃত্যুও আল্লাহ ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হবে না।

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় যা পেশ করা হয়েছে তাতে জানতে পারা যায় যে, মানুষের ভালবাসা, শত্রুতা এবং নিজের বৈষয়িক জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার ও লেন-দেন একান্তভাবে আল্লাহরই জন্য উৎসর্গীকৃত হওয়া মূল ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। তা না হলে উচ্চমর্যাদা লাভ তো দূরের কথা ঈমানই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ ব্যাপারে যতটুকু অপূর্ণতা থাকবে মানুষের ঈমানের ঠিক ততটুকুই অপূর্ণতা থেকে যাবে। পক্ষান্তরে এদিক দিয়ে মানুষ যত পূর্ণতা সহকারে আল্লাহর কাছে সমর্পিত চিত্ত হতে পারবে তার ঈমানও ততটুকুই পূর্ণ হবে।

অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, নিজেকে সর্বোতভাবে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেয়া শুধু উচ্চ মরতবা বা মর্যাদা লাভের জন্যই প্রয়োজন, শুধু ঈমান ও ইসলামের জন্য কারোও মধ্যে এতদূর উন্নতভাবের সৃষ্টি হওয়া কোনো জরুরী শর্ত নয়। অন্য কথায় তাদের ধারণা এই যে, উক্ত রূপ ভাবধারার সৃষ্টি না হলেও মানুষ ঈমানদার মুসলমান হতে পারে। কিন্তু এরূপ ধারণা মূলের দিক দিয়েই ভুল আর সাধারণ মানুষ আইনগত ইসলাম ও আল্লাহর কাছে গণ্য প্রকৃত ইসলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না বলেই এরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

ফিকাহ সম্মত ও আইনগত ইসলামে মানুষের মনের প্রকৃত অবস্থা দেখা হয় না—আর তা দেখা সম্ভবও নয়। বরং মানুষের মৌখিক স্বীকৃতির বাস্তব প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি জরুরী বাহ্যিক নিদর্শন বর্তমান থাকার ওপরই লক্ষ্য আরোপ করা হয়। কেউ যদি মুখে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, পরকাল ও অন্যান্য জরুরী বিষয়ে ঈমান রয়েছে বলে স্বীকার করে অতপর এ মৌখিক স্বীকারোক্তির বাস্তব প্রমাণের জরুরী শর্তগুলো পূরণ করে তবে তাকে ইসলামের সীমার মধ্যে গণ্য করা হবে। তাকে মুসলমান মনে করেই তার সাথে সকল কাজ-কর্ম করা হবে। কিন্তু মূলত এসব বিষয়ই শুধু এ দুনিয়ার জন্য সীমাবদ্ধ এবং এটাতে শুধু বৈষয়িক দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ও তমুদ্দুনিক ভিত্তিই লাভ হয়ে থাকে। এরূপ স্বীকারোক্তির সাহায্যে যারা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করবে তারা সকলেই মুসলিম বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে কাউকে কাফের বলা যাবে না। তারা পরস্পরের কাছ হতে শরীয়াত সম্মত নৈতিক ও সামাজিক অধিকার লাভ করবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারবে, মীরাস বন্টন হবে এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

কিন্তু পরকালে মানুষের মুক্তি লাভ, তার মুসলিম ও মু'মিন রূপে গণ্য হওয়া এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের মধ্যে শামিল হওয়া কেবলমাত্র উক্ত রূপ আইনগত ও মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা সম্ভব নয়, বরং মানুষের মনে স্বীকৃতি আল্লাহর দিকে অন্তরকে সমাহিত করা এবং ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়াই এর জন্য অপরিহার্য শর্ত। পৃথিবীতে মৌখিক স্বীকৃতির মূল্য হয় শুধু কাযীর দরবারে ও সাধারণ মানুষ বা মুসলমানদের মধ্যে ; কেননা তারা কেবল বাহিরকেই দেখতে পারে। কিন্তু আল্লাহ দেখেন মানুষের মন বা অন্তরকে—তার ভিতরকার আসল অবস্থা ও ভাবধারাকে। আল্লাহ মানুষের ঈমানের পরিমাপ করেন। মানুষ তার

জীবন ও মৃত্যুকে তার যাবতীয় কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব, আনুগত্য, দাসত্ব ও গোটা জীবনের কর্মধারাকে আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছে, না অপর কারোও জন্য, আল্লাহর দরবারে ঠিক এ মাপকাঠিতেই মানুষকে যাচাই করা হবে। এ যাচাইয়ের ফলে যদি প্রমাণিত হয় যে, সে এসব কিছু একমাত্র আল্লাহরই জন্য উৎসর্গ করেছিল তবে সে মুসলিম এবং মু'মিন বলে গণ্য হবে, আর অন্য কারোও জন্য উৎসর্গ করে থাকলে সে না মুসলিমরূপে গণ্য হবে, না মু'মিনরূপে। এ দৃষ্টিতে যে যতদূর কাঁচা ও অপরিপক্ক প্রমাণিত হবে তার ঈমান এবং ইসলামও ঠিক ততদূরই অপরিপক্ক হবে। .... দুনিয়ায় সে অতিবড় মুসলিমরূপে গণ্য হলেও এবং সেখানে তাকে অতুল্য মর্যাদা দান করা হলেও আল্লাহর দরবারে তার কোনোই গুরুত্ব হবে না। আল্লাহ যা কিছু আপনাকে দিয়েছেন, আপনি তার সবকিছুই আল্লাহর জন্য—আল্লাহরই নির্দেশিত পথে প্রয়োগ করলেন কি না শুধু এ দিক দিয়েই আল্লাহর কাছে মানুষের মূল্য স্থির হবে। আপনি এরূপ করে থাকলে আপনাকে ঠিক অনুগত ও বন্ধুত্বের প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া হবে। আর কোনো জিনিস যদি আপনি আল্লাহর বন্দেগী হতে দূরে রাখেন, আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রয়োগ না করেন তবে আপনার মুসলিম দাবী করার—অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত করার মৌখিক উক্তি একেবারেই মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং এ মিথ্যা উক্তি দ্বারা দুনিয়ার লোকদেরকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব হলেও হতে পারে ; তারা আপনার এ মৌখিক উক্তি দ্বারা প্রতারিত হয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে আপনাকে স্থান দিতে এবং মুসলিম হিসেবে সকল সুযোগ-সুবিধা দান করতেও পারে। কিন্তু আল্লাহ কখনও তাতে প্রতারিত হবেন না এবং আপনাকে তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত বন্ধুদের মধ্যে গণ্য করবেন না।

আইনগত ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামের এ পার্থক্যের যে ব্যাখ্যা দান করা হলো, তা গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, এর ফলাফল কেবল পরকালেই ভিন্ন ভিন্ন হবে না ; বরং দুনিয়ায়ও এ পার্থক্যের বাস্তব ফল ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। এজন্য দুনিয়ায় যত মুসলমান এসেছে এবং যত মুসলমান এখন দুনিয়ায় রয়েছে তাদের সকলকে উপরোক্ত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

এক ধরনের মুসলমান দেখা যায় যারা আল্লাহ ও রাসূলকে স্বীকার করে ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম হিসেবে মেনে নেয় ; কিন্তু এ ধর্ম নিজেদের সামগ্রিক জীবনের শুধু একটি অংশ বা একটি বিভাগের মর্যাদাই দেয়—তার অধিক নয়। ফলে এ বিশেষ অংশ ও বিভাগে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় স্থাপন করা হয়। ইবাদাত-বন্দেগীর অনুষ্ঠানসমূহ যথারীতি পালন করা

হয়। তাসবীহ পাঠ ও যিকির-আযকার করা হয়। পানাহার ও কোনো কোনো সামাজিক ব্যাপারে পরহেযগারীও অবলম্বন করা হয় ; ধর্ম পালন বলতে যা করণীয় তা প্রায় সবই করা হয়। কিন্তু এ অংশ ও বিভাগ ছাড়া জীবনের অন্যান্য দিকে ও বিভাগে মুসলমানী কাজসমূহ করার কোনো সুযোগই দেয়া হয় না ; সেখানে ভালবাসা হলে তা হয় নিজের প্রতি, নিজ স্বার্থের প্রতি, দেশ ও জাতি কিংবা অন্য কোনো জিনিসের প্রতি আর দুশমনী বা যুদ্ধ করলেও তা করা হয় অনুরূপ কোনো বৈষয়িক স্বার্থের জন্য। তাদের লেন-দেন, তাদের কাজ-কারবার, সম্পর্ক-সম্বন্ধ, তাদের সন্তান-সন্ততি, বংশ-পরিবার, দেশ ও সমাজ এবং অন্যান্য লোকের সাথে ব্যবহার ইত্যাদি সবই হয়ে থাকে দ্বীন ইসলামকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে নিছক বৈষয়িক দৃষ্টিতে। জমিদার, ব্যবসায়ী, শাসনকর্তা, সৈনিক যে যাই হোক না কেন, প্রত্যেকেই একজন স্বাধীন পেশাদার হিসেবে কাজ করে, মুসলমান হিসেবে নয়। এ দিক দিয়ে মুসলমানীকে বিন্দুমাত্র স্থান দেয় না। তারা মিলিত ও সমষ্টিগতভাবে যে তমুদ্দুনিক, শিক্ষামূলক ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণ করে তার ওপর তাদের মুসলমানীর আংশিক প্রভাব পড়লেও তার সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার মুসলমান দেখা যায়, যারা নিজেদের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে, নিজেদের সমগ্র সত্তাকে ইসলামের কাছে সোপর্দ করে দেয়। তাদের জীবনের সমগ্র দিকেই তারা মুসলিমরূপে কর্তব্য সম্পাদন করে। তারা হয় মুসলিম পিতা, মুসলিম সন্তান, মুসলিম স্ত্রী, ব্যবসায়ী, জমির মালিক, মজুর, চাকর —যাই হোক না কেন, সর্বত্র মুসলিম হিসেবেই তাদের জীবন চালিত হয়, তাদের মনের ভাবধারা, আশা-আকাংখা, চিন্তা ও মতবাদ, তাদের রায় ও সিদ্ধান্ত, তাদের ঘৃণা ও ভালবাসা তাদের পসন্দ অপসন্দ সবকিছুই ইসলামী আদর্শের অনুসারেই হবে। তাদের মন ও মগযের ওপর তাদের চোখ ও কানের ওপর, তাদের উদর ও লজ্জাস্থানের ওপর, তাদের হাত-পা ও দেহের যাবতীয় অংগ-প্রত্যংগের ওপর সম্পূর্ণ রূপে ইসলামের আধিপত্য বিরাজ করবে। তাদের স্নেহ ভালবাসা বা শত্রুতা ইসলামের সীমালংঘন করবে না। কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে ইসলামের জন্যই করবে, কারো সাথে লড়াই করলে ইসলামেরই জন্য লড়াই করবে, কাউকে কিছু দান করলে শুধু এ জন্যই দান করবে যে, এরূপ দান করা ইসলামের নির্দেশ। পক্ষান্তরে কাউকে কিছু দেয়া বন্ধ করলে তা ঠিক ইসলামের নির্দেশ অনুসারে বন্ধ করবে। তাদের এরূপ কর্মনীতি ব্যক্তিগত জীবনেই কার্যকর হবে না, তাদের সামগ্রিক জীবনেও সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে ইসলামেরই ভিত্তিতে স্থাপিত হবে। সমষ্টিগতভাবে

তাদের সম্পূর্ণ সত্তাই হবে ইসলামের জন্য নিয়োজিত—ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাদের গোটা জাতীয় চরিত্র ও ভূমিকা ও তাদের কর্মতৎপরতা ইসলামের মূলনীতির বুনিয়াদে স্থাপিত ও পরিচালিত হবে।

এ দু' প্রকারের মুসলমান মূলত সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। আইনের দৃষ্টিতে উভয় শ্রেণী একই উম্মাত তথা একই জাতির মধ্যে গণ্য হলেও এবং 'মুসলিম' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হলেও প্রকৃত ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথম প্রকারের মুসলমানের কোনো কীর্তিই ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বা গৌরবের বস্তুরূপে পরিগণিত হয়নি। তারা এমন কোনো কাজই করেনি, যা পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের কোনো গৌরবময় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পৃথিবী এ ধরনের মুসলমানের কোনো গুরুত্বই কোনো দিন অনুভব করেনি। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামের পশ্চাদমুখী গতি এ ধরনের মুসলমানের দ্বারা এবং এদের কারণেই সম্ভব হয়েছে। মুসলিম সমাজে এ ধরনের মুসলমানদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণেই মানব জীবনের ওপর কুফরির কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়া এবং তার অধিক সীমাবদ্ধ ধর্মীয় জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করেই মুসলমানদের তুষ্ট হওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ কখনই এ ধরনের মুসলমান চাননি। এ ধরনের মুসলমান তৈরি করার জন্য তিনি নবীগণকে পৃথিবীতে পাঠাননি, এ ধরনের মুসলমান বানাবার জন্য তিনি কিতাব নাযিল করেননি। বস্তুত এ ধরনের মুসলমান দুনিয়ায় না থাকলেও বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ অভাব অনুভূত হতো না। আর তা পূরণের জন্য অহী নাযিল করার এ দীর্ঘস্থায়ী ধারা পরিচালনারও প্রয়োজন দেখা দিত না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যে ধরনের মুসলমান তৈরি করার জন্য নবী পাঠিয়েছেন ও কিতাব নাযিল করেছেন, আর যারা ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য কার্যসম্পাদন করেছে এবং এখনও করতে সমর্থ তারা হচ্ছে শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমান।

কেবল ইসলামের ব্যাপারেই একথা সত্য নয়। যারা নিজেদের নীতি ও আদর্শকে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে ও তাকে জীবনের একটি পরিশিষ্টরূপে গণ্য করে এবং নিজেদের জীবন ও মৃত্যু অন্য কোনো জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে তাদের দ্বারা দুনিয়ার কোনো আদর্শেরই পতাকা উন্নীত হতে পারে না। বর্তমান সময়েও একথার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। একটি আদর্শের প্রকৃত নিষ্ঠাবান অনুসারী কেবল তারাই হতে পারে যারা মন ও প্রাণ দিয়ে তার অনুসরণ ও তার খেদমতের কাজে আত্মসমর্পণ করে—যারা নিজেদের পূর্ণ ব্যক্তিসত্তাকে এরই জন্য উৎসর্গ করে এবং যারা নিজেদের অধিকারভুক্ত কোনো জিনিসকে—নিজের প্রাণ ও সন্তানকে পর্যন্ত তা অপেক্ষা

বেশী ভালো না বাসে। বস্তুত দুনিয়ায় এ ধরনের লোকদের দ্বারাই কোনো বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করতে পারে। এজন্যই প্রত্যেকটি আদর্শ এ ধরনের লোকের প্রতীক্ষা করে।

অবশ্য একটি ব্যাপারে ইসলাম ও অন্যান্য আদর্শের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য আদর্শও মানুষের কাছে উল্লেখিত রূপ আত্মসমর্পণ, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আনুগত্যের দাবী করে বটে, কিন্তু মূলত দাবী করার তাদের কোনোই অধিকার নেই। এটা বরং মানুষের ওপর তাদের একটি অন্যায় আবদার মাত্র। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি ইসলামের দাবী অত্যন্ত শাশ্বত ও স্বাভাবিক। একটি আদর্শ যেসব কারণে অন্যান্য মানুষের কাছে তার নিজের সমগ্র জীবন পূর্ণ ব্যক্তি সত্তাকে উৎসর্গ করার দাবী জানায়, মূলত সেসবের মধ্যে একটি জিনিসের জন্য মানুষ তার নিজের কোনো জিনিসকে কুরবান করতে পারে না। কিন্তু ইসলাম যে আল্লাহর জন্য মানুষের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার দাবী করে প্রকৃতপক্ষে সে জন্যই মানুষের উৎসর্গিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহর। মানুষ নিজেই আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের কাছে এবং মানুষের মধ্যে যা আছে, সবকিছুই আল্লাহর মালিকানা। মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব জিনিস দ্বারা কাজ করে তাও আল্লাহর। কাজেই জ্ঞান-বুদ্ধি ও সুবিচারের দৃষ্টিতে এটাই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে, যা আল্লাহর তা আল্লাহরই পথে উৎসর্গ করতে হবে। অপরের জন্য কিংবা নিজ স্বার্থ ও ইপ্সিত বস্তুর জন্য মানুষ যে কুরবানী করে তা মূলত খিয়ানত—অন্যায় ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কিছু করলে তা নিশ্চয়ই খিয়ানত হবে না। কেননা আল্লাহর জন্য যা কিছুই উৎসর্গ করা হয়, তা দ্বারা মূলত আল্লাহরই হক আদায় করা হয়।

কিন্তু যারা বাতিল মতবাদ ও আদর্শ এবং নিজেদের মনগড়া ইলাহ ও প্রভুদের জন্য নিজেদের সবকিছু কুরবান করে এবং সে জন্য অবিচল ও দৃঢ়তা সহকারে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদের কর্মতৎপরতা হতে মুসলমানদের শিক্ষাগ্রহণ করা আবশ্যক। বাতিলের জন্য যখন মানুষ এত নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করতে পারে তখন সত্যের জন্য যদি তার এক সহস্রাংশ ত্যাগ স্বীকার করা না হয় তবে তা কত পরিতাপের বিষয়।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস হতে ঈমান ও ইসলামের যে সঠিক মাপকাঠির সন্ধান পাওয়া যায়, তদনুযায়ী আমাদের প্রত্যেককেই আত্মপরীক্ষা করা কর্তব্য। আপনি যদি ইসলাম কবুল করার ও ঈমান আনার দাবী করেন তবে আপনার জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত কিনা, তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

যাচাই করে দেখা বাঞ্ছনীয়। আপনি একমাত্র আল্লাহরই জন্য জীবিত কিনা, আপনার মন ও মস্তিষ্কের সমগ্র যোগ্যতা-ক্ষমতা, আপনার দেহ ও প্রাণের শক্তি, আপনার সময় ও শ্রম একমাত্র আল্লাহর মর্জী পূরণের জন্য এবং মুসলিম উম্মাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত কিনা তা বিশেষভাবে যাচাই করে দেখা কর্তব্য। আপনার বন্দেগী ও আনুগত্য আল্লাহরই জন্য কিনা, অন্যদিকে নফসের দাসত্ব এবং পরিবার, গোত্র, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজ তথা সরকারের বন্দেগী হতে আপনার জীবন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত কিনা, তাও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আপনার পসন্দ-অপসন্দ আল্লাহর মর্জী অনুযায়ী নির্ধারিত কিনা তাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। আরও বিচার করে দেখুন, আপনি যাকে ভালোবাসেন, স্নেহ করেন, তা কি একমাত্র আল্লাহর জন্য করেন ? .... যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন, তাও কি আল্লাহর জন্য করেন ? এ ঘৃণা ও ভালোবাসায় আপনার নিজের কোনো স্বার্থ কাজ করে না তো ? দেয়া না দেয়াও কি আল্লাহরই জন্য হচ্ছে ? নিজের উদর ও মন সহ দুনিয়ায় যাকে যা কিছু আপনি দেন, তা দিয়ে কি আপনি একমাত্র আল্লাহরই সন্তোষ পেতে চান? পক্ষান্তরে আপনার না দেয়াও কি ঠিক আল্লাহরই জন্য হচ্ছে ? আপনি কি এজন্য দিচ্ছেন না যে, আল্লাহ তাআলা দিতে নিষেধ করেছেন ? এবং না দিয়ে কি আপনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করছেন ? .... এরূপে সবকিছুই আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার ভাবধারা যদি আপনি আপনার নিজের মধ্যে বর্তমান দেখতে পান তবে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করুন। কেননা আল্লাহ সত্যই আপনার ঈমানকে পূর্ণতা দান করেছেন। কিন্তু এদিক দিয়ে যদি আপনি আপনার মধ্যে কোনো প্রকার অভাব অনুভব করেন, তবে তা দূর করার জন্য এখনই যত্নবান হোন, সকল চেষ্টা ও তৎপরতা এদিকে নিবদ্ধ করুন। কেননা এ অভাব পূরণের ওপরই আপনার ইহকালীন সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে। দুনিয়ায় আপনি কোনো মহাসম্পদ লাভ করলেও তা দ্বারা এ অভাব পূরণ হতে পারে না। কিন্তু এ অভাব যদি আপনি পূরণ করে নিতে পারেন, তবে দুনিয়ায় আপনি কিছু না পেলেও প্রকৃতপক্ষে আপনি কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন হাদীসের এ মাপকাঠিতে অপরকে যাচাই করার জন্য এবং তাকে মু'মিন কিংবা মুনাফিক অথবা মুসলিম কিংবা কাফের বলে ঘোষণা করার জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এবং পরকালের বিচারালয়ের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার পূর্বে এ দুনিয়ায় নিজের ত্রুটি জেনে তা সংশোধন করার জন্যই এ মাপকাঠি নির্ধারিত হয়েছে। দুনিয়ার মুফতি ও কাজী আপনাকে কি মনে করছেন সেই চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই,

মহাবিচারক—গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুর একমাত্র জ্ঞাতা—আল্লাহ্ আপনাকে কি স্থান দেন তাই আপনাকে চিন্তা করতে হবে। দুনিয়ার আদমশুমারীর খাতায় আপনি মুসলিম রূপে গণ্য হয়েছেন দেখেই আপনার নিশ্চিত হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। আল্লাহর দফতরে আপনার কি মর্যাদা দেয়া হচ্ছে সেই সম্পর্কে সতর্ক হওয়া আপনার কর্তব্য। সমগ্র পৃথিবী আপনাকে ঈমান ও ইসলামের সার্টিফিকেট দিলেও প্রকৃতপক্ষে আপনার কোনো লাভ নেই। মূল বিচার যে আল্লাহর হাতে তাঁরই কাছে মুনাফিকের পরিবর্তে মু'মিন—অবাধ্যের পরিবর্তে অনুগত বান্দাহ রূপে গণ্য হওয়াই আপনার জীবনের প্রকৃত সাফল্য।

আল্লাহর হুকুম পালন করা দরকার কেন ?

পূর্বেই কয়েকটি প্রবন্ধে আপনাদেরকে আমি বার বার একথাই বলেছি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে চলার নামই ইসলাম এবং মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের খাহেশ, বাপ-দাদার কুসংস্কার, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও লোকদের আদেশ অনুযায়ী চলা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই মুসলমান হতে পারবে না।

কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করার ওপর এত জোর কেন দেয়া হয়, এখানে আমি সেই কথারই বিস্তারিত আলোচনা করবো। একজন মানুষ জিজ্ঞেস করতে পারে যে, আল্লাহর আনুগত্য করার দরকারটা কি, তিনি কি আমাদের আনুগত্য পাবার মুখাপেক্ষী ? আর সে জন্যই কি আল্লাহ আমাদের কাছে তাঁর নিজের এবং তাঁর রাসূলের হুকুম পালন করে চলার দাবী করছেন ? দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যে রকম নিজেদের হুকুমাত চালাবার জন্য লালায়িত, আল্লাহ কি তেমন লালায়িত ?—দুনিয়ার জনগণ যেমন বলে যে, আমার প্রভুত্ব স্বীকার করো আল্লাহও কি তেমনি বলেন ? এখন একথারই আমি জবাব দিতে চাই।

আসল কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছে তার আনুগত্য দাবী করেন তাঁর নিজের স্বার্থের জন্য নয়। বরং এ মানুষেরই কল্যাণের জন্য তিনি তা চাচ্ছেন। আল্লাহ দুনিয়ার রাজা-বাদশাহর মত নন, দুনিয়ার রাজা ও রাজ-কর্মচারীগণ তো শুধু নিজেদেরই স্বার্থের জন্য লোকদের ওপর তাদের হুকুমাত চালায়—লোকদেরকে নিজেদের মর্জীর গোলাম বানাতে চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কোনো স্বার্থ নেই, তিনি সকল রকম স্বার্থের নীচতা হতে পবিত্র। আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করার কোনো দরকার আল্লাহর নেই। প্রাসাদ তৈরি করা, মোটর গাড়ী ক্রয় করা কিংবা আপনাদের টাকা-পয়সা, বিলাস-ব্যসন বা আরাম-আয়েশের সামগ্রী সংগ্রহ করার কোনো প্রয়োজনই তাঁর নেই। তিনি পাক, তিনি কারো মোহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার সবকিছুই তাঁর, সমস্ত ধন-সম্পদের তিনিই একমাত্র মালিক। তিনি আপনাদেরকে তাঁর হুকুম মেনে চলতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে বলেন, শুধু আপনাদেরই মংগলের জন্য—আপনাদেরই কল্যাণ করতে চান তিনি। তিনি মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' করে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর এ শ্রেষ্ঠ মাখলুক বা বিরাট সৃষ্টি মানুষেরা শয়তানের গোলামী করুক, কিংবা অন্য মানুষের দাস

হোক অথবা দুনিয়ার সামান্য ও হীন জিনিসের সামনে মাথা নত করুক এটা তিনি মাত্রই পসন্দ করেন না। তিনি যে মানুষকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন, তারা মূর্খতার অন্ধকারে ঘুরে মরুক এবং পশুর মতো নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চলে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হোক—এটাও তাঁর মনপুত নয়। এজন্যই তিনি মানুষকে বলেছেন ঃ "হে মানুষ ! তোমরা আমারই হুকুম মেনে চল—কেবল আমারই নির্দেশ মত চল—কেবল আমারই আনুগত্য কর। আমি আমার নবীর মারফতে তোমাদের কাছে যে জ্ঞানের আলো পাঠিয়েছি, তা গ্রহণ কর ; তবে তোমরা সরল ও সোজা পথের সন্ধান পেতে পারবে। আর এ সোজা পথে চলে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বত্রই সম্মান লাভ করতে পারবে।"

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ لا يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ - البقرة : ٢٥٦-٢٥٧

"দীন ইসলামের ব্যাপারে কোনো জোর-যবরদস্তি নেই। হেদায়াতের সোজা পথ গোমরাহীর বাঁকা পথ হতে ভিন্ন করে একেবারে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। এখন তোমাদের মধ্যে যারাই মিথ্যা খোদা এবং ভ্রান্ত পথে চালনাকারীদেরকে ত্যাগ করে কেবল এক আল্লাহর প্রতিই ঈমান আনবে, তারা এত মযবুত রজ্জু ধারণ করতে পারবে, যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয়। আল্লাহ সবকিছুই শুনতে পান এবং সবকিছুই তিনি অবগত আছেন। যারা ঈমান আনলো তাদের রক্ষাকারী হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে মুক্তি দান করে আলোকের উজ্জ্বলতম পথে নিয়ে যান। আর যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদেরকে রক্ষা করার ভার তাদের মিথ্যা খোদা ও গোমরাহকারী নেতাদের ওপর অর্পিত হয়। তারা তাদেরকে আলো হতে পথভ্রষ্ট অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। তারা দোযখে যাবে ও সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"–সূরা বাকারা ঃ ২৫৬-২৫৭

আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্য মিথ্যা খোদার হুকুম মানলে ও তাদের আনুগত্য করলে মানুষ কেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, আর কেবল আল্লাহর আনুগত্য

করলেই কেন আলোকোজ্জল পথ লাভ করা যাবে তা আপনাদের বিচার করে দেখা আবশ্যক।

আপনারা দেখছেন, দুনিয়ায় আপনাদের জীবন অসংখ্য রকম সম্পর্কের সাথে জড়িত। আপনাদের প্রথম সম্পর্ক আপনাদের দেহের সাথে। হাত, পা, কান, চোখ, জিহ্বা, মন, মগয এবং পেট সমস্তই আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে দান করেছেন আপনাদের খেদমত করার জন্য। কিন্তু এগুলো দ্বারা আপনারা কিভাবে খেদমত নিবেন, তা আপনাদেরই বিচার করতে হবে। পেটকে কি খেতে দেবেন এবং কি খেতে দিবেন না ; হাত দ্বারা কি করবেন, কি করবেন না ; পা দু'খানিকে কোন্ পথে চালাবেন কোন্ পথে চালাবেন না ; চোখ ও কান দ্বারা কি কাজ করাবেন আর কি কাজ করাবেন না ; মনে কোন্ কথার খেয়াল রাখবেন আর কোন্ কথার রাখবেন না ; মন-মগয দিয়ে কোন্ কথার চিন্তা করবেন আর কোন্ কথার চিন্তা করবেন না—এসবই আপনাকে সবদিক চিন্তা করে ঠিক করতে হবে। এরা সবাই আপনার চাকর এদের দ্বারা আপনি ভালো কাজও করাতে পারেন, আর পাপের কাজও করাতে পারেন। এরা আপনার কাজ করে আপনাকে উচ্চতম মর্যাদার মানুষেও পরিণত করতে পারে আবার এরা আপনাকে জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট ও নীচ জীবও বানিয়ে দিতে পারে।

অতপর আপনার নিকটতম সম্বন্ধ আপনার ঘরের লোকদের সাথে—বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলের সাথে—আপনাকে রাত-দিন সকল সময়ের জন্য সম্বন্ধ রেখে চলতে হয়। কিন্তু এদের সাথে আপনি কিরূপ ব্যবহার করবেন, তা আপনাকে বিশেষভাবে চিন্তা করেই ঠিক করতে হবে। এদের ওপর আপনার কি 'হক' (অধিকার) আছে এবং আপনার ওপরই বা এদের কি অধিকার আছে, তা আপনার ভালো করে জেনে নেয়া দরকার। মনে রাখবেন, এদের সাথে আপনার ব্যবহার সুষ্ঠু হওয়ার ওপরই আপনার দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি ও সফলতা নির্ভর করে। যদি এদের সাথে আপনি ভুল ব্যবহার করেন তবে দুনিয়াকেই আপনি নিজের জন্য জাহান্নামে পরিণত করবেন। আর শুধু দুনিয়াই নয়, পরকালেও আপনাকে আল্লাহর কাছে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।

এরপর আসে দুনিয়ার অন্যান্য অগণিত লোকের সাথে আপনার সম্পর্কের কথা। অনেক লোক আপনার পাড়া-পড়শী, বহুলোক আপনার বন্ধু, কতগুলো লোক আপনার দুশমন। বহুলোক আপনার খেদমত করে এবং আপনি বহুলোকের খেদমত করেন। আপনি কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেন এবং কাউকে আপনি কিছু দেন। কেউ আপনার ওপর ভরসা করে তার কাজের ভার আপনাকে দেয়, আবার আপনি কারো ওপর ভরসা করে আপনার কাজের ভার

তার ওপর অর্পণ করেন। কেউ আপনার বিচারক আর আপনি অন্য কারো বিচারক। আপনি কাউকে হুকুম দেন আবার আপনাকে কেউ হুকুম দেয়। ফলকথা, কত সংখ্যক লোকের সাথে আপনার রাত-দিন কোনো না কোনো সম্পর্ক রেখেই চলতে হয়, যার হিসেব করে আপনি শেষ করতে পারেন না। এ সম্পর্কগুলো আপনাকে খুব ভালোভাবেই রক্ষা করতে হয়। দুনিয়ায় আপনার সুখ-শান্তি, পসন্দ-অপসন্দ, স্ফূর্তি, সফলতা, মান-সম্মান ও সুনাম অর্জন একান্তভাবে এরই ওপর নির্ভর করে। সেগুলোকে খুব ভালোভাবে রক্ষা করতে পারলে আপনি দুনিয়ায় সুখ-শান্তি এবং আনন্দ ও গৌরব লাভ করতে পারেন, নতুবা পারেন না। অনুরূপভাবে যদি পরকালে আপনি আল্লাহর কাছে কারোও অধিকার হরণকারী সাব্যস্ত না হয়ে হাজির হতে পারেন, তাহলে আপনি তার কাছে সম্মান লাভ করতে পারেন এবং সেজন্য আপনাকে এমনভাবে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে যেন আপনি কারো হক নষ্ট করেননি, কারো ওপর যুলুম করেননি, কেউ আপনার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করে না, কারো জীবন নষ্ট করার দায়িত্ব আপনার ওপর নেই এবং কারো জান-মাল ও সম্মান আপনি অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি। কাজেই এখন আপনাকে এই ফায়সালা করতে হবে যে, এই অগণিত লোকের সাথে সঠিকভাবে সম্পর্ক কিভাবে রাখা যাবে এবং যেসব কারণে এসব সম্পর্ক ছিন্ন, নষ্ট বা তিক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে তা জেনে নিয়ে তা থেকে আপনাকে ফিরে থাকতে হবে।

এখন আপনারা চিন্তা করুন যে, আপনাদের দেহের সাথে, আপনাদের পরিবারের লোকদের সাথে এবং দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত লোকের সাথে সঠিক সম্পর্ক রাখার জন্য জীবনের প্রতি ধাপে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো লাভ করা আপনাদের কতখানি আবশ্যক। প্রতি ধাপে আপনার জানা চাই যে, কোন্টা মিথ্যা ? সুবিচার কি এবং যুলুম কি ? আপনার ওপর কার কি পরিমাণ অধিকার আছে এবং আপনারই বা কার ওপর কি পরিমাণ অধিকার আছে ? জীবনের কোন্ কাজে প্রকৃত উপকার পাওয়া যাবে আর কিসে আসল ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ? .... কিন্তু এসব কিছুর জ্ঞান আপনি কোথায় পেতে পারেন ? এটা যদি আপনি আপনার মনের কাছে জানতে চান, তবে সেখানে তা পাবেন না। কারণ আপনার মন নিজেই অজ্ঞ ও মূর্খ, নিজের স্বার্থ ও অসৎ কামনা ছাড়া আর কিছুই জানা নেই। সে তো বলবে ঃ মদ খাও, যেনা কর, হারাম উপায়ে টাকা রোযগার কর। কারণ এসব কাজে খুবই আনন্দ আছে। সে বলবে, সকলেরই হক মেরে খাও, কাউকে হক দিও না। কারণ তাতে লাভও আছে, আরামও আছে। এমন একটা অজ্ঞ-মূর্খের হাতে যদি আপনি আপনার জীবনের রজ্জু ছেড়ে দেন—মন যা চায়, যদি কেবল তাই করেন, তবে এটা

আপনাকে একেবারে অধপতনের চরম সীমায় নিয়ে যাবে। এমনকি, পরিণামে আপনি একজন নিকৃষ্ট স্বার্থপর, হীনচেতা ও পাপিষ্ঠে পরিণত হবেন। এতে আপনার দ্বীন-দুনিয়া সবকিছুই নষ্ট হবে।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে এই যে, আপনি আপনার মনের খাহেশের কথা না শুনে আপনারই মতো অন্য মানুষের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করবেন এবং প্রত্যেক কাজেই আপনি সেই লোকদের কথামত কাজ করবেন। তারা যেদিকে চালায়, আপনি অন্ধভাবে সেদিকেই চলবেন। এ পথ যদি অবলম্বন করেন, তবে কোনো স্বার্থপর লোক এসে আপনাকে তার নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত এবং নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্য ব্যবহার করতে পারে, এর খুবই আশংকা আছে। কিংবা কোনো মূর্খ ও পথভ্রষ্ট লোক এসে আপনাকেও বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। অথবা কোনো যালেম ব্যক্তি আপনাকে হাতিয়ার স্বরূপ গ্রহণ করে আপনার দ্বারা অন্যের ওপর যুলুম করাতে পারে। মোটকথা, অন্য লোকের অনুসরণ করলেও আপনি জ্ঞানের সেই জরুরী আলো লাভ করতে পারেন না, যা আপনাকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝাতে, ন্যায় ও অন্যায় বলে দিতে পারে এবং আপনার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

এরপর একটি মাত্র উৎসই থেকে যায় যেখান থেকে আপনি আপনার এ অত্যাবশ্যক জ্ঞানের আলো লাভ করতে পারেন। সেই উপায়টি হচ্ছে আপনার ও নিখিল জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা সবকিছুই অবগত আছেন, সবকিছুই দেখতে পান, প্রত্যেকটি জিনিসের প্রকৃতি তিনি ভাল করেই জানেন ও বুঝেন। একমাত্র তিনিই বলে দিতে পারেন যে, কোন্ জিনিসে আপনার প্রকৃত উপকার, আর কোন্ জিনিসে আপনার আসল ক্ষতি হতে পারে, কোন্ কাজ আপনার করা উচিত, কোন্ কাজ করা উচিত নয়—তা একমাত্র তিনিই বলে দিতে পারেন। আল্লাহ্ তাআলার কোনো কিছুর অভাব নেই, তাঁর কোনো স্বার্থ নেই, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। তিনি ধোঁকা দিয়ে (নাউযুবিল্লাহ) আপনার কাছ থেকে তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ আদায় করবেন না। কারণ তিনি পাক-পবিত্র, তিনি সবকিছুরই মালিক, তিনি যা কিছু পরামর্শ দিবেন তার মধ্যে তাঁর নিজের স্বার্থের কোনো গন্ধ নেই এবং তা কেবল আপনারই উপকারের জন্য। এছাড়া আল্লাহ্ তাআলা ন্যায় বিচারক, তিনি কখনই কারো ওপর অবিচার করেন না। কাজেই তাঁর সকল পরামর্শ নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ, ন্যায় ও ফলপ্রসু হবে। তাঁর আদেশ অনুযায়ী চললে আপনার নিজের ওপর বা অন্য কারো ওপর কোনো যুলুম হবার আশংকা নেই।

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে যে আলো পাওয়া যায়, তা থেকে কল্যাণ লাভ করা দু'টি জিনিসের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে। প্রথম জিনিস এই যে, আল্লাহ তাআলা এবং তিনি যে নবীর সাহায্যে এ আলো পাঠিয়েছেন সেই নবীর প্রতি আপনাকে প্রকৃত ঈমান আনতে হবে, আপনাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর রাসূল যে বিধান ও উপদেশ নিয়ে এসেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য ; তার সত্যিকার উপকারিতা যদি আপনি অনুভব করতে না-ও পারেন তবুও আপনাকে একথা বিশ্বাস করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ঈমান আনার পর আপনি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি কাজেই আল্লাহর সেই বিধান অনুসরণ করে চলবেন। কারণ তার প্রতি ঈমান আনার পর কার্যত তাঁর অনুসরণ না করলে সেই আলো হতে কিছুমাত্র ফল পাওয়া যেতে পারে না। মনে করুন, কোনো ব্যক্তি আপনাকে বললো, অমুক জিনিসটি বিষ, তা প্রাণীর প্রাণ নাশ করে ; কাজেই তা খেও না। আপনি বললেন, হাঁ ভাই, তুমি যা বলেছ তা খুবই সত্য, তা যে বিষ এবং তা প্রাণ ধ্বংস করে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সত্য জেনে-শুনে বিশ্বাস করে এবং মুখে স্বীকার করেও আপনি তা খেলেন। এখন বিষের যা আসল ক্রিয়া তা তো হবেই। জেনে খেলেও হবে, না জেনে খেলেও হবে। আপনি তা না জেনে খেলেও জেনে খাওয়ার মত একই ফল হতো। এরূপ জানা ও না জানার মধ্যে কার্যত কোনো পার্থক্য নেই। আর এরূপ জানা এবং স্বীকার করার প্রকৃত ফল ও উপকারিতা আপনি ঠিক তখনই পেতে পারেন যখন আপনি কোনো সত্য জানার ও স্বীকার করার সাথে সাথে সেই অনুসারে কাজ করবেন। আপনাকে যে কাজের হুকুম দেয়া হয়েছে, কেবল মুখে মুখে তাকে সত্য বলে স্বীকার করেই বসে থাকবেন না বরং তাকে কাজে পরিণত করবেন। আর যে কাজ করতে আপনাকে নিষেধ করা হয়েছে, শুধু মুখে মুখে তা থেকে ফিরে থাকার কথা মেনে নিলে চলবে না, বরং আপনার জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারেই সেই নিষিদ্ধ কাজ হতে ফিরে থাকতে হবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বার বার বলেছেন ঃ

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ـ النساء : ٥٩

"আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চল।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৫৯)

وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط ـ النور : ٥٤

"যদি তোমরা রাসূলের অনুসরণ কর, তবেই তোমরা সৎপথের সন্ধান পাবে।"-সূরা আন নূর ঃ ৫৪

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ ـ النور : ٦٣

"যারা আমার রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করছে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের ওপর বিপদ আসতে পারে।"–সূরা আন নূর ঃ ৬৩

আমি আপনাদেরকে বারবার বলছি যে, কেবল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলেরই আনুগত্য করা উচিত ; এর অর্থ এই নয় যে, কোনো মানুষের হুকুম আদৌ মানতে হবে না। আসলে এর অর্থ এই যে, আপনারা অন্ধ হয়ে কারো পিছনে চলবেন না। সবসময়ই আপনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেবল এটাই দেখবেন যে, যে ব্যক্তি আপনাকে কোনো কাজ করতে বলে, তা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের অনুরূপ, না তার বিপরীত। যদি তার অনুরূপ হয়, তবে তা মেনে নেয়া অবশ্যই কর্তব্য। কারণ, সেই হুকুম মতো কাজ করলে তাতে আসলে সেই ব্যক্তির নিজের হুকুম পালন করা হয় না, তা করলে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলেরই আনুগত্য করা হবে। আর সে যদি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের বিপরীত হুকুম দেয়, তবে তা তার মুখের ওপর নিক্ষেপ করুন, সে যে ব্যক্তি হোক না কেন। কারণ, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম ছাড়া অন্য কারো হুকুম পালন করা একেবারেই জায়েয নয়।

আপনারা একথা সহজেই বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ তাআলা নিজে মানুষের সামনে এসে হুকুম দেন না, তাঁর যা কিছু হুকুম-আহকাম দেয়ার ছিল, তা সবই তাঁর রাসূলের মারফতে পাঠিয়েছেন। আমাদের সেই প্রিয় নবীও প্রায় চৌদ্দ শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলা যা কিছু হুকুম-আহকাম দিয়েছিলেন, তা সবই এখন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু এ কুরআন শরীফ এমন কোনো জিনিস নয়, যা নিজেই আপনাদের সামনে এসে আপনাদেরকে আল্লাহর কথা বলতে ও হুকুম দান করতে পারে এবং আপনাদেরকে আল্লাহর নিষিদ্ধ পথ হতে বিরত রাখতে পারে। মানুষই আপনাদেরকে কুরআন ও হাদীস অনুসারে পরিচালিত করবে। কাজেই মানুষের অনুসরণ না করে তো কোনো উপায় নেই। অবশ্য অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, আপনারা কোনো মানুষের পিছনে অন্ধভাবে চলবেন না। আপনারা সতর্কভাবে শুধু এতটুকুই দেখবেন যে, সেই লোকেরা আপনাদেরকে পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুসারে পরিচালিত করে কিনা। যদি কুরআন ও হাদীস অনুসারে চালায় তবে তাদের অনুসরণ করা আপনাদের কর্তব্য এবং তার বিপরীত পথে চালালে তাদের অনুসরণ করা পরিষ্কার হারাম।

দ্বীন ও শরীয়াত

ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা বলার সময় আপনারা দু'টি শব্দ প্রায়ই শুনে থাকেন এবং আপনারা নিজেরাও প্রায়ই বলে থাকেন। সেই দু'টি শব্দের একটি হচ্ছে দ্বীন ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে শরীয়াত। কিন্তু অনেক কম লোকই এ শব্দ দু'টির অর্থ ও তাৎপর্য ভালো করে জানে। যারা লেখা-পড়া জানে না, তারা এর অর্থ না জানলে তা কোনো অপরাধের কথা নয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভালো ভালো শিক্ষিত লোকেরা—এমন কি বহু মৌলভী সাহেব পর্যন্ত শব্দ দু'টির সঠিক অর্থ এবং এ দু'টির পারস্পরিক পার্থক্য সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল নন। এ দু'টির অর্থ ভালো করে না জানায় অনেক সময় 'দীন'কে শরীয়াতের সাথে এবং শরীয়াতকে দীনের সাথে একেবারে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেয়া হয়। এতে অনেক প্রকার ভুল বুঝাবুঝি হয়ে থাকে। এ প্রবন্ধে আমি খুব সহজ কথায় এ শব্দ দু'টির অর্থ আপনাদের কাছে প্রকাশ করবো।

দীন (دين) শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। প্রথম ঃ শক্তি, কর্তৃত্ব, হুকুমাত, রাজত্ব-আধিপত্য এবং শাসন ক্ষমতা। দ্বিতীয় ঃ এর সম্পূর্ণ বিপরীত যথা—নীচতা, আনুগত্য, গোলামি, অধীনতা এবং দাসত্ব। তৃতীয়, হিসেব করা ফায়সালা করা ও যাবতীয় কাজের প্রতিফল দেয়া। কুরআন শরীফে 'দ্বীন' (دين) শব্দটি এ তিন প্রকারের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ قف - ال عمران : ١٩

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তাই হচ্ছে একমাত্র 'দীন' যাতে মানুষ শুধু আল্লাহ তাআলাকেই শক্তিমান মনে করে এবং তাকে ছাড়া আর কারো সামনে নিজেকে নত মনে করে না। কেবল আল্লাহকেই মনিব, মালিক, বাদশাহ ও রাজাধিরাজ বলে মানবে এবং তিনি ছাড়া আর কারো দাস, গোলাম, হুকুম বরদার, অধীন ও তাবেদার হবে না। শুধু আল্লাহকেই হিসেব গ্রহণকারী ও সকল কাজের উপযুক্ত প্রতিফলদাতা মনে করবে এবং তিনি ছাড়া আর কারো কাছে হিসেব দেয়ার পরোয়া করবে না ; অন্য কারো কাছে প্রতিফল পাবার আশা করবে না এবং কারো শাস্তির ভয় করবে না। এ 'দীনের'ই নাম হচ্ছে 'ইসলাম'। কোনো মানুষ যদি এ আকীদা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আসল শক্তিমান, আইন রচয়িতা, আসল বাদশাহ ও মালিক, প্রকৃত প্রতিফলদাতা মনে করে এবং তার সামনে বিনয়ের সাথে মাথা নত করে, যদি তাঁর বন্দেগী ও গোলামী করে, তাঁর আদেশ মতো কাজ করে এবং তার প্রতিফলের আশা ও তার শাস্তির ভয় করে, তাহলে তাকে মিথ্যা 'দীন' মনে করতে হবে। আল্লাহ এমন

'দীন' কখনও কবুল করবেন না। কারণ এটা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ খেলাপ। এ নিখিল পৃথিবীতে আসল শক্তিমান ও সম্মানিত সত্তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নয়। এখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো আধিপত্য নেই, বাদশাহী নেই। আর মানুষকে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও গোলামী করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। সেই আসল মালিক ছাড়া কাজের প্রতিফল দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। একথাই অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج - ال عمران : ٨٥

অর্থাৎ আল্লাহর আধিপত্য ও প্রভুত্ব ছেড়ে যে ব্যক্তি অন্য কাউকে নিজের মালিক এবং আইন রচয়িতা বলে স্বীকার করে, তার বন্দেগী ও গোলামী কবুল করে এবং তাকে কাজের প্রতিফলদাতা মনে করে, তার এ 'দ্বীন'কে আল্লাহ তাআলা কখনই কবুল করবেন না। কারণ ঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لا حُنَفَاءَ - البينة : ٥

"মানুষকে আল্লাহ তাঁর নিজের বান্দাহ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করার আদেশ মানুষকে দেয়া হয়নি। তাদের একমাত্র অবশ্য কর্তব্য ফরয এই যে, সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু আল্লাহর জন্যই নিজের দ্বীন—অর্থাৎ আনুগত্য ও গোলামীকে নিযুক্ত করবে, একমুখী হয়ে তাঁরই বন্দেগী করবে এবং শুধু তাঁরই হিসেব করার ক্ষমতাকে ভয় করবে।"–সূরা আল বাইয়্যেনা ঃ ৫

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا

وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ - ال عمران : ٨٣

"মানুষ কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলামী ও হুকুম পালন করতে চায়? অথচ প্রকৃতপক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলারই একান্ত গোলাম ও হুকুম পালনকারী এবং এসব জিনিসকে তাদের নিজেদের হিসাব-কিতাবের জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে যেতে হবে না। তবুও মানুষ কি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের বিরুদ্ধে আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া আর অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়?"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ لا

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○ - الصف : ٩

"আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও সত্যের আনুগত্যের ব্যবস্থা সহকারে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, তিনি দুনিয়ার সকল 'মিথ্যা খোদার' খোদায়ী ও প্রভুত্ব ধ্বংস করে দিবেন এবং মানুষকে এমনভাবে আযাদ করবেন যে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দাহ হবে না, কাফের আর মুশরিকগণ নিজেদের মূর্খতার দরুন যতই চীৎকার করুক না কেন এবং একে ঘৃণা করুক না কেন।"–সূরা আস সফ ঃ ৯

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج - الانفال : ٣٩

"তোমরা যুদ্ধ কর যেন দুনিয়া হতে গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব চিরতরে দূর হয় এবং দুনিয়ায় যেন শুধু আল্লাহরই আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর বাদশাহী যেন সকলেই স্বীকার করে এবং মানুষ যেন শুধু আল্লাহরই বন্দেগী করে।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৩৯

ওপরের এ ব্যাখ্যা দ্বারা 'দ্বীন' শব্দের অর্থ পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে আশা করি। সংক্ষেপে বলতে গেলে তা এই—আল্লাহকে মালিক, মনিব এবং আইন রচনাকারী স্বীকার করা—আল্লাহরই গোলামী, বন্দেগী ও তাবেদারী করা, আল্লাহর হিসাব গ্রহণের ও তাঁর শাস্তি বিধানের ভয় করা এবং একমাত্র তাঁরই কাছে প্রতিফল লাভের আশা করা।

তারপরও যেহেতু আল্লাহর হুকুম তাঁর কিতাব ও রাসূলের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে থাকে, এজন্য রাসূলকে আল্লাহর রাসূল এবং কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে মান্য করা আর কার্যক্ষেত্রে তার অনুসরণ করাও 'দ্বীন'-এর মধ্যে গণ্য। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ لا فَمَنِ اتَّقٰى
وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ - الاعراف: ٣٥

"হে আদম সন্তান ! আমার নবী যখন তোমাদের কাছে বিধান নিয়ে আসবে তখন যারা সেই বিধানকে মেনে আদর্শবাদী জীবনযাপন করবে এবং সেই অনুসারে নিজেদের কাজ-কারবার সমাপন করবে, তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৩৫

এর দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ সোজাসুজি প্রত্যেক মানুষের কাছে তাঁর বিধান পাঠান না, বরং তার নবীদের মাধ্যমেই পাঠিয়ে থাকেন। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে আইন রচনাকারী বলে স্বীকার করবে সেই ব্যক্তি কেবল নবীদের হুকুম পালন করে এবং তাঁদের প্রচারিত বিধানের আনুগত্য করেই আল্লাহর হুকুম পালন করতে পারে একে বলা হয় 'দ্বীন'।

অতপর শরীয়াতের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করবো। শরীয়াত শব্দের অর্থ ঃ পথ ও নিয়ম। একজন মানুষ যখন আল্লাহকে আইন রচনাকারী বলে তার বন্দেগী স্বীকার করে এবং একথাও স্বীকার করে নেয় যে, রাসূল আল্লাহর তরফ হতেই অনুমতি প্রাপ্ত আইনদাতা হিসেবে এসেছেন এবং কিতাব তাঁরই তরফ হতেই নাযিল হয়েছে, ঠিক তখনই সে দ্বীন-এর মধ্যে দাখিল হয়। এরপরে যে নিয়ম অনুযায়ী তাকে আল্লাহর বন্দেগী করতে হয় এবং তাঁর আনুগত্য করার জন্য যে পথে চলতে হয় তারই নাম হচ্ছে শরীয়াত। এ পথ ও কর্মপদ্ধতি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের মারফতে পাঠিয়েছেন। মালিকের ইবাদাত কোন্ নিয়মে করতে হবে, পাক-পবিত্র হওয়ার নিয়ম কি, নেকী ও তাকওয়ার পথ কোন্টি, অন্য মানুষের হক কিভাবে আদায় করতে হবে, কাজ-কারবার কিভাবে করতে হবে, জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে, এসব কথা নবীই বলেছেন। দ্বীন ও শরীয়াতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দ্বীন চিরকালই এক ছিল এক আছে এবং চিরকাল একই থাকবে ; কিন্তু শরীয়াত দুনিয়ায় বহু এসেছে, বহু বদলিয়ে গেছে। অবশ্য শরীয়াতের এ পরিবর্তনের কারণে দ্বীনের কোনো দিনই পরিবর্তন হয়নি। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন যা ছিল হযরত নূহ আল-াইহিস সালামের দ্বীনও তাই ছিল, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দ্বীনও তাই ছিল। হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম, হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম এবং হযরত হুদ আলাইহিস সালামের দ্বীনও তাই ছিল এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনও ঠিক তাই। কিন্তু এ নবীগণের প্রত্যেকেরই শরীয়াতে কিছু না কিছু পার্থক্য বর্তমান ছিল। নামায এবং রোযার নিয়ম এক এক শরীয়াতে এক এক রকমের ছিল। হারাম ও হালালের হুকুম, পাক-পবিত্রতার নিয়ম, বিয়ে ও তালাক এবং সম্পত্তি বন্টনের আইন এক এক শরীয়াতের এক এক রকম ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উম্মতগণও মুসলমান ছিলেন, আর আমরাও মুসলমান কেননা সকলের দ্বীন এক। এর দ্বারা জানা গেল যে, শরীয়াতের হুকুম বিভিন্ন হলেও দ্বীন এক থাকে, তাতে কোনো পার্থক্য হয় না—দ্বীন অনুসারে কাজ করার নিয়ম-পন্থা যতই বিভিন্ন হোক না কেন।

এ পার্থক্য বুঝার জন্য একটা উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে। মনে করুন, একজন মনিবের বহু সংখ্যক চাকর আছে। যে ব্যক্তি সেই মনিবকে মনিব বলে স্বীকার করে না এবং তার হুকুম মান্য করা দরকার বলে মনেই করে না, সে তো পরিষ্কার নাফরমান এবং সে চাকরের মধ্যে গণ্যই নয়। আর যারা তাকে মনিব বলে স্বীকার করে, তার হুকুম পালন করা কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে এবং তার

হুকুমের অবাধ্য হতে ভয় করে, তারা সকলেই চাকরের মধ্যে গণ্য। চাকুরী করা এবং খেদমত করার নিয়ম বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মূলত তারা সকলেই সমানভাবে সেই একই মনিবের চাকর, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। মালিক বা মনিব যদি একজন চাকরকে চাকুরীর এক নিয়ম বলে দেয় আর অন্যজনকে বলে আর এক নিয়ম তবে এদের কেউই একথা বলতে পারে না যে, আমি মনিবের চাকর কিন্তু ঐ ব্যক্তি চাকর নয়। এভাবে মনিবের হুকুমের অর্থ ও উদ্দেশ্য যদি এক একজন চাকর এক এক রকম বুঝে থাকে এবং উভয়েই নিজের নিজের বুদ্ধি মত সেই হুকুম পালন করে, তবে চাকুরীর বেলায় উভয়ই সমান। অবশ্য হতে পারে যে, একজন চাকর মনিবের হুকুমের অর্থ ভুল বুঝেছে, আর অন্যজন এর অর্থ ঠিকমত বুঝেছে। কিন্তু হুকুম মত কাজ উভয়েই যখন করেছে, তখন একজন অন্যজনকে নাফরমান অথবা মনিবের চাকুরী হতে বিচ্যুত বলে অভিযুক্ত করতে পারে না।

এ উদাহরণ হতে আপনারা দ্বীন ও শরীয়াতের পারস্পরিক পার্থক্য খুব ভাল করে বুঝতে পারেন। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন নবীর মারফতে বিভিন্ন শরীয়াত পাঠিয়েছিলেন। এদের একজনকে চাকরীর এক রকমের নিয়ম বলেছেন, আর অন্যজনকে বলেছেন অন্যবিধ নিয়ম। এ সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করে আল্লাহর হুকুম মতো যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন—যদিও তাদের চাকুরির নিয়ম ছিল বিভিন্ন রকমের। তারপর যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ায় তাশরীফ আনলেন, তখন সকলের মনিব আল্লাহ তাআলা হুকুম করলেন যে, এখন পূর্বের সমস্ত নিয়মকে আমি বাতিল করে দিলাম। ভবিষ্যতে যে আমার চাকুরি করতে চায় তাকে ঠিক সেই নিয়ম অনুসারেই কাজ করতে হবে, যে নিয়ম আমার শেষ নবীর মাধ্যমে আমি প্রচার করবো। এরপর পূর্বের কোনো নিয়ম অনুসারে চাকুরি করার কারো অধিকার নেই। কারণ যদি কেউ এ নূতন নিয়মকে স্বীকার না করে এবং এখনও সেই পুরাতন নিয়ম মতো চলতে থাকে, তবে বলতে হবে যে, সে আসলে মনিবের হুকুম মানছে না, সে তার নিজের মনের কথাই মানছে। কাজেই এখন সে চাকুরি হতে বরখাস্ত হয়েছে।—অর্থাৎ ধর্মের পরিভাষায় সে কাফের হয়ে গেছে।

প্রাচীন নবীগণকে যারা এখনও মেনে চলতে চায় তাদের সম্বন্ধে একথাই প্রযোজ্য। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগামী যারা তাদের সম্পর্কে উল্লেখিত উদাহরণের দ্বিতীয় অংশ বেশ খেটে যায়। আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে

আমাদের কাছে যে শরীয়াত পাঠিয়েছেন, তাকে যারা আল্লাহর শরীয়াত বলে স্বীকার করে এবং তা পালন করা কর্তব্য বলে মনে করে, তারা সকলেই মুসলমান। এখন এই শরীয়াতকে একজন যদি একভাবে বুঝে থাকে আর একজন অন্যভাবে এবং উভয়ই নিজ নিজ বুদ্ধিমত সেই অনুসারে কাজ করে তবে তাদের বাহ্যিক কাজে পরস্পরের মধ্যে যতই পার্থক্য হোক না কেন, তাদের কেউই চাকুরি হতে বিচ্যুত হবে না। কারণ এই যে, তাদের প্রত্যেকেই যে নিয়মে কাজ করছে সে একান্তভাবে মনে করে যে, তা আল্লাহর দেয়া নিয়ম এবং এটা বুঝেই সে সেই নিয়ম অনুসরণ করছে। কাজেই একজন চাকর কেমন করে বলতে পারে যে, আমিই খাঁটি চাকর আর অমুক খাঁটি চাকর নয়। সে বেশী কিছু বললেও শুধু এতটুকু বলতে পারে যে, আমি মনিবের হুকুমের ঠিক অর্থ বুঝেছি, আর অমুক লোক ঠিক অর্থ বুঝতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে অন্যজনকে চাকুরি হতে খারিজ করে দেয়ার বা খারিজ মনে করার তার কোনো অধিকার নেই ; তবুও যদি কেউ এতখানি দুঃসাহস করে তবে আসল মনিবের পদকে সে নিজের বিনা অধিকারে দখল করছে। তার কথার অর্থ এই হয় যে, তুমি তোমার মনিবের হুকুম মানতে যেরূপ বাধ্য, আমার হুকুম মানতেও তুমি অনুরূপভাবে বাধ্য। আমার হুকুম যদি তুমি না মান তাহলে আমি আমার ক্ষমতা দ্বারা মনিবের চাকুরি হতে তোমাকে খারিজ করে দিব। একটু ভেবে দেখুন, এটা কত বড় স্পর্ধার কথা। এ কারণেই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে অকারণে কাফের বলবে, তাঁর কথা স্বয়ং তার নিজের ওপরই বর্তিবে। কারণ মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা নিজের হুকুমের গোলাম বানিয়েছেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি বলে—না, তুমি আমার বুদ্ধি ও আমার মতের গোলামী কর। অর্থাৎ শুধু আল্লাহই তোমার ইলাহ নন, আমিও তোমার একজন ছোট ইলাহ এবং আমার হুকুম না মানলে আমার নিজের ক্ষমতার দ্বারা তোমাকে আল্লাহর বন্দেগী হতে খারিজ করে দেব—আল্লাহ তাআলা তাকে খারিজ করুন আর না-ই করুন। আর এ ধরনের কথা যারা বলে তাদের কথায় অন্য মুসলমান কাফের হোক বা না হোক কিন্তু সে নিজেকে কাফেরীর বিপদে জড়িয়ে ফেলে।

দ্বীন ও শরীয়াতের পার্থক্য আপনারা ভাল করে বুঝতে পেরেছেন আশা করি। সেই সাথে একথাও আপনারা জানতে পেরেছেন যে, বন্দেগীর বাহ্যিক নিয়মের পার্থক্য হলেও আসল দ্বীনে কোনো পার্থক্য হয় না। অবশ্য তার জন্য শর্ত এই যে, মানুষ যে পন্থায়ই কাজ করুক না কেন, নেক নিয়তের সাথে করা কর্তব্য এবং একথা মনে রেখে করতে হবে যে, যে নিয়মে সে কাজ করছে, তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলেরই নিয়ম।

এখন আমি বলবো যে, দ্বীন ও শরীয়াতের এ পার্থক্য না বুঝতে পেরে আমাদের মুসলমান জামায়াতের কতই না অনিষ্ট হচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে নামায পড়ার নানা রকম নিয়ম আছে। একদল বুকের ওপর হাত বেঁধে থাকে, অন্যদল নাভির ওপর হাত বাঁধে। একদল ইমামের পিছনে মোকতাদী হয়ে আলহামদু সূরা পড়ে, আর একদল তা পড়ে না ; একদল শব্দ করে 'আমীন' বলে, আর একদল বলে মনে মনে। এদের প্রত্যেকেই যে নিয়মে চলছে একথা মনে করেই চলছে যে, এটা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই নিয়ম। কাজেই নামাযের বাহ্যিক নিয়ম বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এরা সকলেই সমভাবে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগামী। কিন্তু যেসব যালেম লোক শরীয়াতের এসব খুঁটিনাটি মাসয়ালার বিভিন্নতাকে আসল দ্বীনের বিভিন্নতা বলে মনে করে নিয়েছে এজন্যই তারা নিজেদের আলাদা দল গঠন করে নিয়েছে, মসজিদ ভিন্ন করে তৈরি করেছে। একদল অন্যদলকে গালাগালি করে, মসজিদ হতে মেরে বের করে দেয়, মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করে এবং এভাবে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতকে টুকরো টুকরো করে দেয়।

এতেও এ শয়তানদের দিল ঠাণ্ডা হয় না বলে ছোট ছোট ও সামান্য ব্যাপারে একজন অপরজনকে কাফের, ফাসেক ও গোমরাহ বলে আখ্যা দিতে থাকে। এক ব্যক্তি কুরআন ও হাদীস হতে নিজ নিজ বুদ্ধি মতো আল্লাহর হুকুম বের করে। এখন সে যা বুঝেছে সেই অনুসারে নিজের কাজ করাকেই সে যথেষ্ট বলে মনে করে না ; বরং সে নিজের এ মতকে অন্যের ওপরও যবরদস্তি করে চাপিয়ে দিতে চায়। আর অন্য লোক যদি তা মানতে রাজী না হয় তাহলে তাকে কাফের ও আল্লাহর দ্বীন হতে খারিজ মনে করতে শুরু করে।

মুসলমানদের মধ্যে আপনারা এই যে হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস ইত্যাদি নানা দলের নাম শুনতে পান এরা সকলে পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে সর্বশেষ কিতাব বলে বিশ্বাস করে এবং নিজের নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তা থেকে আইন ও বিধান জেনে নেয়। হতে পারে একজনের সিদ্ধান্ত ঠিক ও বিশুদ্ধ, আর অন্যজনের সিদ্ধান্ত ভুল। আমিও একটা নিয়ম অনুসরণ করে চলি এবং তাকে শুদ্ধ বলে মনে করি। আর এর বিরোধী লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনাও করি—আমি যাকে শুদ্ধ বলে বুঝেছি, তা তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করি, আর যাকে আমি ভুল মনে করি, তার দোষ-ত্রুটিও তাদের বুঝাতে চাই। কিন্তু কারো সিদ্ধান্ত ভুল হওয়া এক কথা আর দ্বীন হতে খারিজ হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নিজ নিজ বিবেক অনুসারে শরীয়াতের কাজ করার অধিকার প্রত্যেক মুসলমানেরই আছে। দশজন মুসলমান যদি দশটি বিভিন্ন নিয়মে কাজ

করে, তবু যতক্ষণ তাঁরা শরীয়াত মানবে ততক্ষণ তাঁরা সকলেই মুসলমান, একই উম্মাতের মধ্যে গণ্য ; তাদের ভিন্ন ভিন্ন দল-গোষ্ঠী গঠন করার কোনোই কারণ নেই। কিন্তু এ নিগূঢ় কথা যারা বুঝতে পারে না, তারা অতি ছোট ছোট ও সামান্য সামান্য কারণে দলাদলি করে। একদল অন্যদলের সাথে ঝগড়া বাঁধায়, নামায ও মসজিদ আলাদা করে, একদল অন্যদলের সাথে বিয়ে-শাদী, মিলা-মিশা এবং সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে বন্ধ করে দেয় আর নিজ মতের লোকদেরকে নিয়ে একটা আলাদা দল গঠন করে। মনে হয় তারা আলাদা নবীর উম্মাত।

আপনারা ধারণা করতে পারেন যে, এরূপ দলাদলির ফলে মুসলমানের কি বিরাট ক্ষতি হয়েছে। কথায় বলা হয় যে, মুসলমান একদল—এক উম্মাত। এ উপমহাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ৮ কোটি।[১] এতবড় একটা দল যদি বাস্তবিকই সংঘবদ্ধ হতো এবং পরিপূর্ণ একতার সাথে আল্লাহর কালামকে বুলন্দ করার জন্য কাজ করতো, তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাদেরকে দুর্বল মনে করতে পারতো না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দলাদলির কারণেই এ উম্মাতটি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের একজনের মন অন্যজনের প্রতি বিষাক্ত ও শ্রদ্ধাহীন। বড় বড় বিপদের সময়ও তারা একত্রিত হয়ে বিপদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না। একদলের মুসলমান অন্যদলের মুসলমানকে ঠিক ততখানিই শত্রু বলে মনে করেন, যতখানিই এক ইহুদী একজন খৃষ্টানকে শত্রু বলে মনে করে, বরং তা থেকেও অধিক। এমনও দেখা গেছে যে, একদল মুসলমানকে পরাজিত করার জন্য আর একদল মুসলমান কাফেরদের সাথে যোগ দিয়ে ষড়যন্ত্র করে। এমতাবস্থায় দুনিয়ার মুসলমান যদি দুর্বল হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এটা তাদের নিজেদেরই কর্মফল। তাদের ওপর সেই আযাবই নাযিল হয়েছে যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন মজিদে বলেছেন ঃ

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط - الانعام : ٦٥

"মানুষের প্রতি আল্লাহর এমন আযাবও আসতে পারে, যার ফলে তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হবে, তোমরা পরস্পর কাটাকাটি করে মরবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ৬৫

ওপরে যে আযাবের কথা বলা হলো, এতদাঞ্চলে তা খুব বেশী পরিমাণেই দেখা যায়। এখানে মুসলমানের নানা দল ; এমনকি আলেমদের দলেরও কোনো হিসেব নেই। এজন্যই এখানকার মুসলমান এবং আলেমদের কোনো

১. এ বক্তৃতা ১৯৩৭-৩৮ সালে পাঠান কোটে (দুরুল ইসলামে) প্রদত্ত হয়েছিল।

শক্তি নেই। আপনারা যদি বাস্তবিকই মঙ্গল চান, তবে আপনাদের ও আলেমদের এ বিভিন্ন দল ভেংগে দিন। আপনারা পরস্পর পরস্পরের ভাই হিসেবে এক উম্মাতরূপে গঠিত হোন। ইসলামী শরীয়াতে এরূপ হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস প্রভৃতি আলাদা আলাদা দল গঠন করার কোনো অবকাশ নেই। এরূপ দলাদলি মূর্খতার কারণেই হয়ে থাকে। নতুবা আল্লাহ তাআলা তো একটি মাত্র দল তৈরি করেছেন এবং সেই একটি মাত্র দলই হচ্ছে মুসলমান।

সমাপ্ত